বঙ্গ কমলবার্তা

সংখ্যা-নভেম্বর। সাল-২০২৫

জননায়ক ভগবান বিরসা মুন্ডা

২৪ শে কলিঙ্গ
২৫ শে অঙ্গ
২৬ শে বঙ্গ

জনজাতি গৌরব দিবসে গুজরাটের দেদিয়াপাড়ায় ভগবান বিরসা মুন্ডা ও তাঁর পরিবারের প্রতি শ্রদ্ধা অর্পন প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীর।

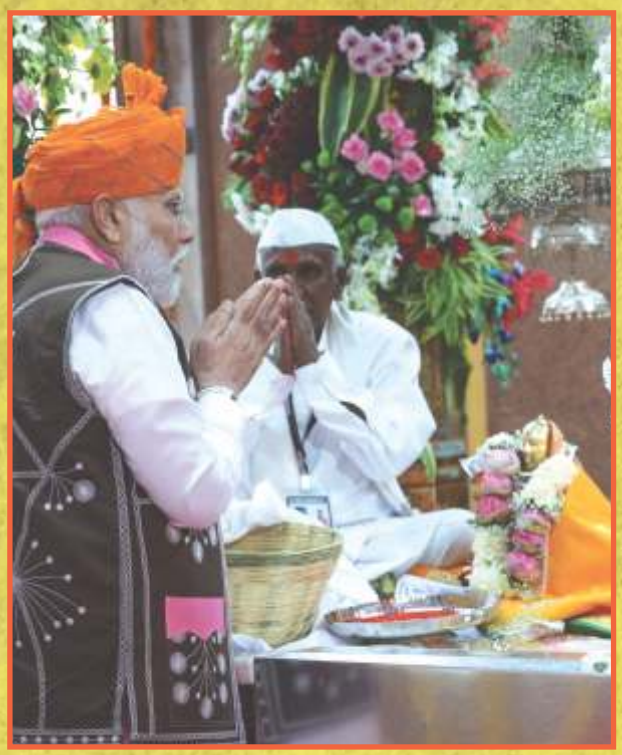

ভগবান বিরসা মুন্ডার ১৫০তম জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে জনজাতি গৌরব দিবসে দেবমোগরা মাতার মন্দিরে প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীর শ্রদ্ধাঞ্জলি।

বিহার বিধানসভা নির্বাচনে এনডিএ-র বিপুল জয়ের পর নয়াদিল্লিতে বিজেপির সদর দফতরে বিহারবাসীকে ধন্যবাদ জানাতে প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী।

বঙ্গ
কমলবার্তা
নভেম্বর সংখ্যা। ২০২৫

জন্মশতবর্ষে অটল বিহারী বাজপেয়ী ৪
বন্দে মাতরম: এক সনাতন মন্ত্র ৬
অমিত শাহ

ভারতবর্ষে জাতীয়তাবাদের উত্থানে বঙ্কিমচন্দ্র এবং বন্দেমাতরম-এর ভূমিকা ৮
অয়ন বন্দ্যোপাধ্যায়

সার্ধশতবর্ষে বন্দেমাতরম্: ফিরে দেখা ১১
কৌশিক কর্মকার

জাতপাত নয়, যে বিহার ভারতের কথা বলে ১৪
জয়ন্ত গুহ

তৃণমূলের বাংলাদেশী বাঁচাও যাত্রা ১৬
শুভ্র চট্টোপাধ্যায়

ছবিতে খবর ১৮

জননায়ক ভগবান বিরসা মুন্ডা ২৪
স্বাতী সেনাপতি

এসআইআর: পশ্চিমবঙ্গের জনবিন্যাস রক্ষার শেষ সুযোগ ২৮
সৌভিক দত্ত

মহিলা ক্রিকেটে ভারতের বিশ্বজয়: কংগ্রেসের করুণা নয়, নারীসম্মান মোদী সরকারের মূলমন্ত্র ৩২
অভিরূপ ঘোষ

সম্পাদক: জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায়
কার্যনির্বাহী সম্পাদক : অয়ন বন্দ্যোপাধ্যায়
সহযোগী সম্পাদক : জয়ন্ত গুহ
সম্পাদকমন্ডলী:
অভিরূপ ঘোষ, কৌশিক কর্মকার, সৌভিক দত্ত, অনিকেত মহাপাত্র
সার্কুলেশন: সঞ্জয় শর্মা

সম্পাদকীয়

লোকনায়ক জয়প্রকাশ নারায়ণ এবং কর্পূরী ঠাকুরের বিহার শুধুমাত্র যে জাতীয় গণতান্ত্রিক জোটের প্রার্থীদের বিপুল ভোটে নির্বাচিত করল শুধু তাই নয়, নিঃশব্দে শিক্ষা দিয়ে গেল। বাংলা ও বাঙালীর জন্য শিক্ষা। বাংলার রাজনৈতিক সংস্কৃতির জন্য শিক্ষা। নির্বাচন চলাকালীন কোথাও কোনও বুথ দখল নেই। খুন-জখম-মারামারিও নেই। বিহারে যদি হতে পারে বাংলায় হয় না কেন? 'বদলা নয়, বদল চাই'-এর স্লোগান দিয়ে যে দল ক্ষমতায় এসেছিল তারা কেন পারেনা মানে পারলোনা গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রতি সম্মান রাখতে? বদলার পথ থেকে সরে যেতে? একটি নির্বাচনে মানুষ তো বিরোধী দলকেও নির্বাচিত করে। কেন সেই বিরোধী দলের কর্মীদের বাংলার নির্বাচিত সরকার রক্ষা করতে পারেনা? কেন ডায়মন্ড হারবার থেকে জলপাইগুড়ি, বিজেপি কর্মীরা রাস্তায় রক্তাক্ত হবে বিহার নির্বাচনে মানুষের রায়ে উল্লসিত হলে? দেশের কোন একটি প্রদেশের নির্বাচনের রায় নিয়ে আনন্দ উদযাপন করায় কোনও ফতোয়া আছে নাকি পশ্চিমবঙ্গে? নাকি বাংলায় আনন্দ উদযাপনে ফতোয়া আছে শুধুমাত্র বিরোধী দলের কর্মীদের? অবাক কাণ্ড!

তবে তার থেকেও তাজ্জব বিষয় সম্ভবত বাংলায় তৃণমূলের এসআইআর বিরোধিতা। যে তৃণমূল মিটিং-মিছিল করে চেঁচাচ্ছে যে বাংলায় এসআইআর মানছি না-মানবো না, সেই তৃনমূলই আবার সবচেয়ে বেশী রাস্তায় এসআইআর নিয়ে ক্যাম্প করছে। টিনের ভাঙা তলোয়ার হাতে যাত্রা পার্টির রাবনের মত হুঙ্কার, একজনও বৈধ ভোটারের নাম যেন বাদ না যায়। সে কাজ তো নির্বাচন কমিশনের কাজ। সেই কাজটা করতেই তো এসআইআর। কিন্তু নিউটাউন থেকে স্বরুপনগর, রাতের অন্ধকারে চোরের মত বাংলাদেশী অবৈধ ভোটাররা যখন পালাচ্ছে বাংলাদেশের দিকে। সীমান্তে দাঁড়িয়ে তারা যখন বলছে মাত্র ৩ হাজার টাকায় তারা এদেশে ঢুকে বহাল তবিয়তে কাজকর্ম করছিল তখন তো প্রশ্ন ওঠে, এই অবৈধ বাংলাদেশীরা এরাজ্যে শুধু নয় খোদ কলকাতায় কার প্রশ্রয়ে ঘাঁটি গেড়েছিল? কেন এই অবৈধ অনুপ্রবেশকারীদের আস্তানা ভেঙ্গে গুড়িয়ে দেওয়া হল না? দেশের নিরাপত্তা নিয়ে ভাবার দায়িত্ব এ রাজ্যের প্রশাসনের নেই? কে দেবে এর উত্তর? কে নেবে এর দায়?

যে দল সরকারিভাবে সারাক্ষন শুধু বাঙালী-অবাঙালীর বিভাজন করে তাঁদের রাজত্বে কেন বাঙালীর মাছে-ভাতে হাত পড়ল? কেন মৎস্য উৎপাদনে আমরা সারা দেশের তুলনায় ১১ শতাংশ পিছিয়ে আছি? কাদের প্রশ্রয়ে প্রোমোটাররা বুজিয়ে দিচ্ছে খাল-বিল-দিঘী-পুকুর? কেন মাছের চারা এখানে বড় করা হয়না? কেন যায় অন্ধ্রপ্রদেশ? তাতে কার লাভ? কে দেবে উত্তর?

এমন হাজারো প্রশ্নের উত্তর এবার তো দিতে হবে। হবেই। কেননা মা গঙ্গা বিহার হয়ে তো বাংলাতেই প্রবেশ করে। আর উত্তর না দিতে পারলে- ২০২৬-এর নির্বাচনে, বিসর্জন তো নিশ্চিত তৃণমূলের।

জন্মশতবর্ষে অটল বিহারী বাজপেয়ী

"আধুনিক ভারত গঠনে অটল বিহারী বাজপেয়ীর অবদান ছিল অনস্বীকার্য। বাজপেয়ী প্রধানমন্ত্রী থাকাকালীন গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক ইনফ্রাস্ট্রাকচার এবং বড় ও দীর্ঘ হাইওয়ে নির্মাণ প্রকল্প শুরু করেন এবং বাস্তবায়নও করেন। যার মধ্যে অন্যতম গোল্ডেন কোয়াড্রিলেটেরাল। দ্বিতীয় মেয়াদে প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর তিনি ভারতের সবচেয়ে যানজটপূর্ণ এলাকার তালিকা করেন এবং শহরগুলোর মধ্যে নিরবচ্ছিন্ন যাতায়াত ব্যবস্থা নিশ্চিত করার জন্য চার লেনের ফ্রি-ওয়ে তৈরি বাস্তবায়ন করেন, এই রাস্তাই মুম্বই, চেন্নাই, কলকাতা, দিল্লিকে এক করে দিয়েছিল।

অর্থনীতি সংস্কারের জন্য তাঁর ফিসকাল পলিসি ভারতের অভ্যন্তরীণ অর্থনীতিতে সুস্থিতি বজায় রাখতে সাহায্য করেছিলো। তাঁর সময়ে ভারতের জিডিপি বেসরকারি খাতে ০.৮%-২.৩% পর্যন্ত হয়েছিলো। তাঁর সময়েই দেশ বহু প্রাকৃতিক দুর্যোগের মুখোমুখি হয়। একটি বড় ভূমিকম্প, দুটি সাইক্লোন, একটি বড় ধরনের খরা সহ ছিল বিপুল তেলের ঘাটতি, কারগিল যুদ্ধ এবং পার্লামেন্ট অ্যাটাকের মত ঘটনা। কিন্তু এত কিছুর মধ্যেও বাজপেয়ী অর্থনীতির হাল ধরে রেখেছিলেন। তাঁর নেওয়া পলিসি বা নীতির কারণেই বিপ্লব ঘটে যায় টেলিকম ইন্ডাস্ট্রিতে।"

“সর্বশিক্ষা অভিযান ছিল ভারতের প্রধানমন্ত্রী অটল বিহারী বাজপেয়ীর স্বপ্নের প্রকল্প। তার স্বপ্ন ছিল ভারতের সকল নাগরিক প্রাথমিক শিক্ষায় শিক্ষিত হবে। তার মতে, প্রাথমিক বিদ্যালয়ে থাকতেই একটি শিশুকে সঠিকভাবে গড়ে তোলা সম্ভব। ভারতে প্রাথমিক শিক্ষা নিয়ে সমস্যা ছিল বহুকাল ধরে। কিন্তু বাজপেয়ী প্রধানমন্ত্রী হয়ে আসার পর পুরো প্রাথমিক শিক্ষা সংক্রান্ত ব্যবস্থাকে নতুন করে গড়ে তোলেন। প্রাথমিকভাবে এই অভিযান শুরু হয়েছিল ১৮টি প্রদেশের ২৭২টি জেলায়।

প্রায় ৮৫ শতাংশ ব্যয় বহন করে কেন্দ্রীয় সরকার। কিছু অর্থ ওয়ার্ল্ড ব্যাংক, ডিএফআইডি এবং ইউনিসেফ থেকে সরবরাহ করা হয়। ২০০১ সালের দিকে প্রায় ৫০ মিলিয়ন শিশুকে এই প্রকল্পের আওতায় এনে প্রাথমিক শিক্ষা দেওয়া হয়। বর্তমানে এতে প্রায় ২০ কোটি প্রাথমিক পর্যায়ের ছাত্র-ছাত্রী, ১৫ লক্ষ প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং ৬৭ লক্ষ শিক্ষক-শিক্ষিকা নিয়োজিত আছে। এই পরিসংখ্যান থেকে বোঝা যাচ্ছে, কতটুকু সফল ছিল তার এই প্রকল্প। ভারতে শিক্ষার হার বাড়ানোর ক্ষেত্রে এই উদ্যোগ এক নব দিগন্তের সূচনা করে।”

এক সনাতন মন্ত্র

আমাদের দেশের ইতিহাসে এমন অনেক গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্ত এসেছে যখন গান এবং শিল্প সামাজিক ও রাজনৈতিক আন্দোলনের প্রাণ হয়ে উঠেছে। ছত্রপতি শিবাজি মহারাজের সেনাবাহিনীর যুদ্ধের গান, স্বাধীনতা সংগ্রামের সময় গাওয়া দেশাত্মবোধক সঙ্গীত, অথবা জরুরি অবস্থার সময় তরুণদের গাওয়া প্রতিরোধের সঙ্গীত সর্বদা ভারতীয় সমাজে সমষ্টি চেতনা এবং ঐক্যকে জাগ্রত করেছে।

ঠিক একইভাবে, বন্দে মাতরমের গল্প যুদ্ধক্ষেত্রে নয়, শুরু হয়েছে এক পণ্ডিত শ্রী বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সত্য সংকল্পে। ১৮৭৫ সালে জগদ্ধাত্রী পূজার (কার্তিক শুক্লা নবমী বা অক্ষয় নবমী) দিনে রচিত তাঁর স্তোত্র ভারতের স্বাধীনতার চিরন্তন গান হয়ে ওঠে। ভারতীয় সভ্যতার গভীরতম শিকড় থেকে তিনি তুলে এনেছিলেন তাঁর সেই পবিত্র শব্দবন্ধ যাতে অনুরণিত হয় অথর্ববেদের ঘোষণা "মাতা ভূমিঃ পুত্রোহম পৃথিব্যঃ" ("পৃথিবী আমার মা, এবং আমি তার পুত্র") থেকে শুরু করে দেবীমাহাত্ম্যে দেবী মাতার আবাহন।

একইসঙ্গে প্রার্থনা এবং ভবিষ্যদ্বাণী উভয়ই প্রতিফলিত হয়েছে বঙ্কিমচন্দ্রের 'বন্দে মাতরম' স্তোত্র-এ। 'বন্দে মাতরম' কেবল ভারতের জাতীয় সঙ্গীত নয়, কেবল স্বাধীনতা আন্দোলনের আত্মাও নয় - এটি প্রকৃতপক্ষে শ্রী বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের অন্তর্দৃষ্টিতে সাংস্কৃতিক জাতীয়তাবাদের প্রথম ঘোষণা। এটি আমাদের মনে করিয়ে দেয় যে একটি দেশ কেবল একটি ভৌগোলিক অঞ্চল নয়, বরং একটি ভূ-সাংস্কৃতিক সভ্যতা। একটি জাতি

বা দেশ কেবলমাত্র সীমানায় নয়, বরং বিস্তৃত থাকে তার তীর্থ, স্মৃতিঘেরা পবিত্র ভূমি, ত্যাগ এবং মাতৃত্বের বোধে।

মহর্ষি অরবিন্দের কথায়, বঙ্কিমচন্দ্র ছিলেন আধুনিক ভারতের এক ঋষি যিনি তাঁর শব্দবন্ধের মাধ্যমে জাতির আত্মাকে পুনরুজ্জীবিত করেছিলেন। তাঁর উপন্যাস আনন্দমঠও ছিল গদ্যের আকারে এক মন্ত্র যা একটি ঘুমন্ত জাতিকে তার ঐশ্বরিক শক্তি পুনরাবিষ্কারের জন্য উদ্বুদ্ধ করেছিল। তাঁর একটি চিঠিতে, বঙ্কিমবাবু লিখেছিলেন, "আমার কোনও আপত্তি থাকবে না যদি আমার সমস্ত রচনা গঙ্গায় ফেলে দেওয়া হয়; এই একটি স্তোত্রই অনন্তকাল বেঁচে থাকবে। এটি একটি মহান গান হবে এবং মানুষের হৃদয় জয় করবে।" একজন ভবিষ্যৎদ্রষ্টা না হলে এমন কথা কেই বা বলতে পারে! ঔপনিবেশিক ভারতের সবচেয়ে অন্ধকার সময়ে লেখা 'বন্দে মাতরম' আত্মজাগরণে উদয়ের গান হয়ে ওঠে, এমন একটি স্তোত্র যা সাংস্কৃতিক জাতীয়তাবাদ এবং সভ্যতার গর্বকে এক সুরে বেঁধে দিয়েছিল। মাতৃভূমির প্রতি ভক্তিতে পরিপূর্ণ একজন ব্যক্তিই কেবল এই ধরণের পংক্তি লিখতে পারেন।

বন্দে মাতরমের গল্প যুদ্ধক্ষেত্রে নয়, শুরু হয়েছে এক পণ্ডিত শ্রী বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সত্য সংকল্পে। ১৮৭৫ সালে জগদ্ধাত্রী পূজার (কার্তিক শুক্লা নবমী বা অক্ষয় নবমী) দিনে রচিত তাঁর স্তোত্র ভারতের স্বাধীনতার চিরন্তন গান হয়ে ওঠে। ভারতীয় সভ্যতার গভীরতম শিকড় থেকে তিনি তুলে এনেছিলেন তাঁর সেই পবিত্র শব্দবন্ধ যাতে অনুরণিত হয় অথর্ববেদের ঘোষণা "মাতা ভূমিঃ পুত্রোহম পৃথিব্যঃ" ("পৃথিবী আমার মা, এবং আমি তার পুত্র") থেকে শুরু করে দেবীমাহাত্ম্যে দেবী মাতার আবাহন।

১৮৯৬ সালে, গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নিজের দেওয়া সুরে 'বন্দে মাতরম' গেয়েছিলেন কলকাতায় কংগ্রেস অধিবেশনে। অমরত্ব পায় 'বন্দে মাতরম', ছড়িয়েপড়েসবারকণ্ঠে।'বন্দেমাতরম'ভাষা ও অঞ্চলের বাধা অতিক্রম করে ভারতজুড়ে প্রতিধ্বনিত হয়েছিল। তামিলনাড়ুতে মহাকবি সুব্রহ্মণ্য ভারতী তামিল ভাষায় 'বন্দে মাতরম' অনুবাদ করে পরিবেশন করেছিলেন এবং পাঞ্জাবে ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে বিপ্লবীদের কাছে প্রতিবাদের বীজমন্ত্রহয়েওঠে'বন্দেমাতরম'।

১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গের সময়, যখন বঙ্গদেশ জুড়ে বিদ্রোহ ছড়িয়ে পড়ে, তখন ব্রিটিশ সরকার 'বন্দে মাতরম'-এর প্রকাশ্য পাঠ নিষিদ্ধ করে। তবুও ১৪ এপ্রিল ১৯০৬ সালে বরিশালে হাজার হাজার মানুষ এই আদেশ অমান্য করে। পুলিশ যখন শান্তিপূর্ণ জনতার উপর আক্রমণ চালায়, তখন পুরুষ ও মহিলা উভয়ই রাস্তায় রক্তাক্ত অবস্থায় দাঁড়িয়ে ও চিৎকার করতে থাকে 'বন্দে মাতরম' বলে।

ক্যালিফোর্নিয়ায় গদর পার্টি, আজাদ হিন্দ ফৌজ এবং ১৯৪৬ সালে নৌ-বিদ্রোহ বা রয়েল ইন্ডিয়ান নেভি বিদ্রোহে বিপ্লবীদের কাছে 'বন্দে মাতরম' ছিল পবিত্র স্লোগান। ক্ষুদিরাম বসু থেকে আশফাকুল্লা খান, রাজগুরু থেকে তিরুপুর কুমারন – প্রত্যেকের কণ্ঠে এই স্লোগান একসঙ্গে প্রতিধ্বনিত হয়েছিল। 'বন্দে মাতরম' তখন হয়ে উঠেছিল ভারতের ঐক্যবদ্ধ হৃৎস্পন্দন। মহাত্মা গান্ধীও স্বীকার করেছিলেন যে 'বন্দে মাতরম'-এর মধ্যে আছে "অলস রক্তকে উজ্জীবিত করার জাদুকরী শক্তি"। এই মন্ত্র উদারপন্থী থেকে শুরু করে বিপ্লবী, পণ্ডিত থেকে সৈনিক সবাইকে ঐক্যবদ্ধ করেছিল। মহর্ষি অরবিন্দ ভাষায় 'বন্দে মাতরম' ছিল "ভারতের পুনর্জন্মের মন্ত্র।"

গত ২৬শে অক্টোবর, প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী তাঁর 'মন কি বাত' ভাষণে সমগ্র জাতিকে বন্দে মাতরমের গৌরবময় উত্তরাধিকারের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। এই অমর স্তোত্রের ১৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষে, ভারত সরকার ৭ নভেম্বর থেকে শুরু করে এক বছর ধরে দেশব্যাপী কর্মসূচি আয়োজনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এই উদযাপনের মাধ্যমে, 'বন্দে মাতরম'-এর পূর্ণাঙ্গ সংস্করণ আবারও দেশজুড়ে প্রতিধ্বনিত হবে, যা যুবসমাজের মনে 'সাংস্কৃতিক জাতীয়তাবাদ'-এর ধারণাকে আত্মস্থ করতে অনুপ্রাণিত করবে।

আমরা যখন 'ভারত পর্ব' উদযাপন করি এবং সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের জন্মবার্ষিকীতে তাঁকে শ্রদ্ধা জানাই, তখন আমাদের মনে পড়ে যে, কীভাবে সর্দারের 'এক ভারত' ভাবনার জীবন্ত প্রতিমূর্তি ছিল ' বন্দে মাতরম' - এর চেতনা। এই গান কেবল অতীতের স্মৃতি নয়, ভবিষ্যতের প্রতি আহ্বানও। 'বিকশিত ভারত ২০৪৭'-এর লক্ষ্যে আজ 'বন্দে মাতরম' আমাদের সংকল্প মন্ত্র। এই মন্ত্রশক্তিই অনুপ্রেরণা হয়ে উঠুক এক 'আত্মনির্ভর' এবং 'শ্রেষ্ঠ ভারত' নির্মাণে।

'বন্দে মাতরম' আমাদের স্বাধীনতার গান, অটল সংকল্পের চেতনা এবং ভারতের জাগরণের প্রথম মন্ত্র। এই পবিত্র মন্ত্র অনন্তকাল ধরে প্রতিধ্বনিত হবে, যা আমাদের ইতিহাস, সংস্কৃতি, মূল্যবোধ এবং ঐতিহ্যকে ভারতীয় দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখার কথা মনে করিয়ে দেবে।

বন্দে মাতরম!

ভারতবর্ষে জাতীয়তাবাদের উত্থানে বঙ্কিমচন্দ্র এবং বন্দেমাতরম-এর ভূমিকা

অয়ন বন্দ্যোপাধ্যায়

বঙ্কিমচন্দ্র শুধু সাহিত্যসম্রাট এবং বাংলা সাহিত্যের ভগীরথই নন- তাঁর রচনার সামাজিক, রাজনৈতিক ও দার্শনিক গুরুত্বও ছিল অপরিসীম। বঙ্গ তথা ভারতবর্ষে জাতীয়তাবাদের উত্থানের পিছনে তাঁর রচনাগুলি অগ্রগণ্য ভূমিকা পালন করেছিল। ভারতবর্ষে জাতীয়তাবাদের উদগাতা ঋষি বঙ্কিমকে শুধুমাত্র নৈহাটির বঙ্কিম করে রাখার প্রয়াস কি ইচ্ছাকৃত না অনিচ্ছাকৃত?

উনবিংশ শতক বাঙ্গালী-জীবনে এক খুবই গুরুত্বপূর্ণ সময়। আমরা বাঙ্গালী-মহাপুরুষ বলতে মূলত যাঁদের বুঝি তাঁদের প্রায় সকলেরই জন্ম এই শতকে। কিন্তু এই শতকেই কিছু ইংরেজি শিক্ষিত বাঙ্গালী পাশ্চাত্ত্যের অন্ধ অনুকরণে ব্রতী হয়েছিলেন। এর বিরুদ্ধে যারা পাশ্চাত্ত্যের দর্শন-ইতিহাস থেকে শেখার পাশাপাশি ভারতীয় সংস্কৃতি-ঐতিহ্য-ধর্ম থেকেই ভারতীয়দের আত্মশক্তি অর্জন করে ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে লড়াই করা উচিত বলে মনে করতেন তাঁদের পুরোধা ছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র। প্রখ্যাত ইতিহাসবিদ অমলেশ ত্রিপাঠী তাঁর The Extremist Challenge গ্রন্থে (যার বাংলা অনুবাদ হল ভারতের মুক্তিসংগ্রামে চরমপন্থী পর্ব) ভারতীয় রাজনীতিতে চরমপন্থী মতবাদের ভাবগত পটভূমি তৈরীর পিছনে তিনজন ব্যক্তিত্বের ভূমিকার কথা বলেছেন- বঙ্কিমচন্দ্র, স্বামী বিবেকানন্দ ও দয়ানন্দ সরস্বতী। Charles Himesath তাঁর The Indian Nationalism and Hindu Social Reform গ্রন্থে বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্য-কৃতির মধ্যেই চরমপন্থী রাজনৈতিক আদর্শের উৎস আবিষ্কার করেছেন। বহু ইউরোপীয় ও ভারতীয় পণ্ডিতও একই মনোভাব পোষণ করেন। বঙ্কিমচন্দ্র বিশ্বাস করতেন যে, বিদেশ থেকে আমদানী করা কোন তত্ত্ব নয়, এ দেশের আবহাওয়া, মানুষের শারীরিক ও মানসিক বৈশিষ্ট্য এবং ঐতিহ্যই তার ভিত্তি হতে পারে।

বঙ্কিমচন্দ্রের বিভিন্ন লেখালেখি কিভাবে জাতীয়তাবাদ ও চরমপন্থার আদর্শগত উৎস হিসাবে কাজ করেছিল- এবার সেগুলোই একটু দেখা যাক।

কৃষ্ণচরিত্র: বঙ্কিমচন্দ্রের কৃষ্ণচরিত্র প্রকাশিত হবার পর অবিশ্বাস্য দ্রুততায় শ্রীকৃষ্ণই হয়ে ওঠেন চরমপন্থী মাত্রেরই আদর্শ পুরুষ। বঙ্কিমের কৃষ্ণ হলেন গীতার শ্রীকৃষ্ণ। যিনি বলেন-

"যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানধর্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্।।
পরিত্রাণায় সাধুনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে।।"

এই শ্রীকৃষ্ণ অতি দূরে সরে থাকা, নির্লিপ্ত ঈশ্বর নন। তিনি ধর্ম সংস্থাপনের জন্য দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালনের কাজে সদা তৎপর। শ্রীকৃষ্ণের গুণাবলীর মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্র সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব আরোপ করেছেন তাঁর অতুলনীয় নেতৃ-প্রতিভার ওপর, তাঁর সামরিক জ্ঞান ও সাম্রাজ্য সংগঠনী কুশলতার ওপর। শ্রীকৃষ্ণ স্বপ্ন দেখেছিলেন এক ঐক্যবদ্ধ ভারতবর্ষের, আর এই স্বপ্নকে পূরণ করার জন্যই কুরুক্ষেত্রে অগণিত ক্ষুদ্র সামন্ত রাজাকে বিনাশ করে এক সুবিশাল, সংহত ধর্মরাজ্য সৃষ্টি করেছিলেন। এ প্রসঙ্গে মনে রাখতে হবে যে, বঙ্কিমচন্দ্রের এই ধর্মরাজ্যের সঙ্গে প্রতীচ্যের পররাজ্যলিপ্সু উগ্র জাতীয়তাবাদের কোন সাদৃশ্য ছিল না।

বঙ্কিমচন্দ্রের কৃষ্ণচরিত্র প্রকাশিত হবার পর তিলক রচনা করলেন গীতার মারাঠি ভাষ্য, অরবিন্দ লিখলেন গীতার দীর্ঘ ভূমিকা, লাজপৎ রায় উর্দু ভাষায় শ্রীকৃষ্ণের জীবনী প্রণয়ন করলেন, ভক্তিযোগের ব্যাখ্যা লিখলেন অশ্বিনী কুমার দত্ত, ব্রাহ্ম বিপিনচন্দ্র পাল শ্রীকৃষ্ণকে 'ভারত-আত্মা' হিসাবে

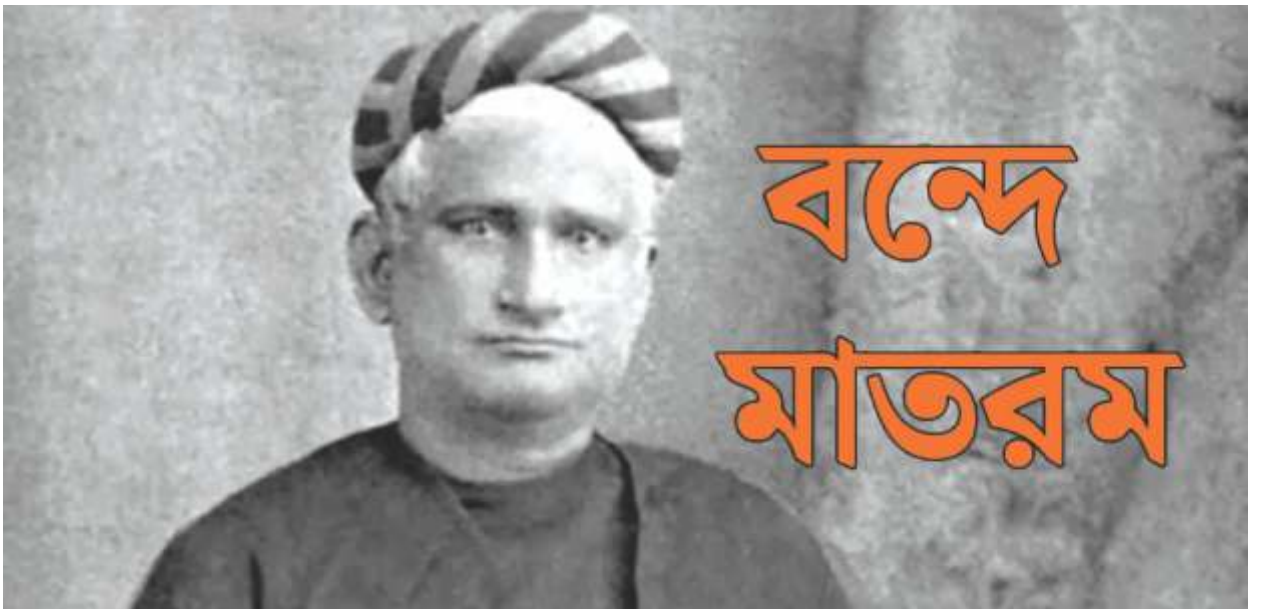

ভারতবর্ষে জাতীয়তাবাদের উদগাতা ঋষি বঙ্কিম।

অভিহিত করেন, এমনকি ক্যাথলিক ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় লিখে ফেললেন- শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব।—এতটাই ছিল বঙ্কিমের কৃষ্ণ চরিত্রের প্রভাব।

ধর্মতত্ত্ব (অনুশীলন): বঙ্কিমচন্দ্রের ধর্মতত্ত্ব (অনুশীলন) গ্রন্থের আদর্শে ও এর নাম অনুসারে বঙ্গের সবথেকে খ্যাতনামা বিপ্লবী সমিতি 'অনুশীলন সমিতি' প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯০২-এ। অনুশীলন সমিতির বিশিষ্ট বিপ্লবী জীবনতারা হালদার তাঁর অনুশীলন সমিতির ইতিহাস গ্রন্থে লিখেছেন যে "ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের অনুশীলন তত্ত্বে শারীরিক, মানসিক, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উৎকর্ষ সমন্বিত আদর্শ মানব গঠনের যে নির্দেশ আছে- তাহাই হইল অনুশীলন সমিতির ভিত্তি।"

আনন্দমঠ ও বন্দেমাতরম্: আনন্দমঠ ও বন্দে মাতরম্ হল ভারতীয় জাতীয়তাবাদের বিকাশে বঙ্কিমচন্দ্রের সবচেয়ে বড় অবদান। আনন্দমঠ উপন্যাসে ভবানন্দ সর্বপ্রথম মহেন্দ্রকে 'বন্দে মাতরম্' গেয়ে শোনান। সন্ন্যাসী বিদ্রোহের পটভূমিকায় আনন্দমঠ লেখা হয়েছিল। দেশকে দেশমাতৃকা রূপে দেখান এখানে বঙ্কিমচন্দ্রের সবথেকে বড় কৃতিত্ব।

এই উপন্যাসে আমরা দেখি ব্রহ্মচারী সত্যানন্দ মহেন্দ্রকে বিভিন্ন যুগে দেশমাতৃকার নানা রূপ দেখাচ্ছেন। প্রথমে ব্রহ্মচারী মহেন্দ্রকে দেখাচ্ছেন, এক অপরূপ সর্বাঙ্গসম্পন্না, সর্বাঙ্গবরণভূষিতা জগদ্ধাত্রী মূর্তি। মহেন্দ্র তাঁর পরিচয় জিজ্ঞাসা করলে ব্রহ্মচারী সর্বানন্দ বললেন, "মা যা ছিলেন"। তারপর ব্রহ্মচারী কক্ষান্তরে মহেন্দ্রকে নিয়ে গিয়ে দেখালেন মা কালীর মূর্তি। বললেন "দেখ, মা যা হইয়াছেন..... কালী- অন্ধকারসমাচ্ছন্না, কালিমাময়ী। হৃতসর্বস্বা, এই জন্য নগ্নিকা। আজি দেশের সর্বত্রই শ্মশান- তাই মা কঙ্কালমালিনী।" তারপর ব্রহ্মচারী সত্যানন্দ মহেন্দ্রকে দেখালেন মর্ম্মর প্রস্তর নির্মিত একটি মন্দিরের মধ্যে সোনার তৈরী দশভুজা দুর্গা প্রতিমা। ব্রহ্মচারী মহেন্দ্রকে বললেন, "এই মা যা হইবেন। দশভুজ দশ দিকে প্রসারিত,- তাহাতে নানা আয়ুধরূপে নানা শক্তি শোভিত, পদতলে শত্রু বিমর্দিত, পদাশ্রিত বীরকেশরী শত্রু নিপীড়নে নিযুক্ত, দিগভুজা, নানা প্রহরণধারিণী, শত্রুবিমর্দিনী- বীরেন্দ্র পৃষ্ঠবিহারিণী- দক্ষিণে লক্ষ্মী ভাগ্যরূপিণী- বামে বাণী বিদ্যাবিজ্ঞানদায়িনী- সঙ্গে বলরূপী কার্তিকেয়, কার্যসিদ্ধিরূপী গণেশ।" মহেন্দ্র ব্রহ্মচারীকে জিজ্ঞাসা করল যে- মায়ের এই মূর্তি কবে দেখতে পাব? উত্তরে ব্রহ্মচারী সত্যানন্দ বললেন- "যবে মার সকল সন্তান মাকে মা বলিয়া ডাকিবে, সেইদিন উনি প্রসন্ন হইবেন।

এখানে বিভিন্ন দেবীমূর্তির কথা বলে বঙ্কিমচন্দ্র বিভিন্ন সময়ে ভারতবর্ষের অবস্থা বোঝাতে চেয়েছেন। প্রথমে স্বর্ণালঙ্কারভূষিতা জগদ্ধাত্রী হচ্ছেন প্রাচীন সমৃদ্ধশালী ভারতবর্ষের প্রতীক। তারপর নগ্নিকা, হৃতসর্বস্বা, শ্মশানচারিণী মা কালী মুসলিম ও ব্রিটিশ আমলে অত্যাচারিতা, লুণ্ঠিতা, পরাধীনা দেশমাতৃকার প্রতীক। এরপর লক্ষ্মী-সরস্বতী-গণেশ-কার্তিক সহ স্বর্ণনির্মিত দশভুজা দুর্গা মূর্তির মাধ্যমে ভবিষ্যৎ স্বাধীন ভারতবর্ষের এক প্রতিচ্ছবি অঙ্কনের চেষ্টা করেছেন বঙ্কিম।

ঋষি অরবিন্দের ভাষায়- বন্দেমাতরম্ ধ্বনি এক নতুন ধর্মের জন্ম দিল- যা হল দেশপ্রেমের ধর্ম। বঙ্কিমচন্দ্র ভবিষ্যৎবাণী করেছিলেন- একদিন দেখিবে এই গানে বঙ্গদেশ মাতিয়া উঠিবে। বাস্তবে হয়েছিলও তাই। ১৯০৫ থেকেই বঙ্গসমেত সারা ভারতবর্ষে বন্দেমাতরম্ দেশপ্রেমের মন্ত্র। স্বাদেশিকতার প্রতীক হয়ে দাঁড়াল। অনুশীলন সমিতির আদর্শের অন্যতম উৎসও হয়ে দাঁড়ায় আনন্দমঠ ও বন্দেমাতরম্।

বঙ্কিমের ইতিহাস চেতনা: বঙ্কিমচন্দ্র 'বাঙ্গালার ইতিহাস' প্রবন্ধে আক্ষেপ করে বলেছিলেন, "সাহেবরা যদি পাখি মারিতে যান, তাহারও ইতিহাস লিখিত হয়, কিন্তু বাঙ্গালার ইতিহাস নাই।" বঙ্কিম বুঝেছিলেন সঠিক ইতিহাস-জ্ঞান একটি জাতির উত্থানের জন্য আবিশ্যিক। আর মিথ্যা, বিকৃত ইতিহাস যে একটি জাতিকে ভিতর থেকে ফাঁপা করে দিতে পারে তাও তিনি বুঝেছিলেন। বিশিষ্ট ইতিহাসবিদ রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর "ঐতিহাসিক গবেষণায় বঙ্কিমচন্দ্র" প্রবন্ধে ইউরোপে যখন বিজ্ঞানসম্মত ইতিহাস-চর্চার শৈশবাবস্থা এবং বঙ্গে

যখন ইতিহাসচর্চা প্রায় শুরুই হয়নি বলা যায়- সেই সময় বঙ্কিমচন্দ্রের ইতিহাস-চেতনা ও ইতিহাস-লেখনীর ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। বঙ্কিম মিনহাজ উস সিরাজের তবকৎ-ই-নাসিরী-তে প্রাপ্ত বখতিয়ার খলজীর সপ্তদশ অশ্বারোহী নিয়ে বঙ্গ-বিজয়ের কাহিনিতে কোনদিনই বিশ্বাস করেননি। তিনি বলেছিলেন- "সপ্তদশ অশ্বারোহী লইয়া বখতিয়ার খিলিজি বাঙ্গালা জয় করিয়াছিল, একথা যে বাঙ্গালীতে বিশ্বাস করে, সে কুলাঙ্গার।" তিনি এই ঘটনাকে অসম্ভব বলে মনে করেন এবং বখতিয়ার যে বঙ্গের খুব কম অংশকেই দখল করতে পেরেছিলেন, তাও উল্লেখ করেন। বর্তমানে আমরা জানি যে বঙ্কিমের দাবী ঐতিহাসিকভাবে সত্য। বখতিয়ার শুধু কয়েক বছরের জন্য বর্তমান পশ্চিমবঙ্গের মধ্যবঙ্গের কিছু অংশ দখলে রাখতে পেরেছিলেন। বাকি উভয় বঙ্গের অধিকাংশ অঞ্চলই লক্ষ্মণ সেনের পুত্র বিশ্বরূপ সেন, কেশব সেন-সহ তাঁর উত্তরাধিকারীরা বহু বছর যাবৎ শাসন করেন। মৃণালিনী উপন্যাসেও বঙ্কিম বখতিয়ার-সংক্রান্ত কিংবদন্তিটির বিরোধিতা করেছেন।

বঙ্কিমচন্দ্র কি মুসলমান-বিরোধী ছিলেন?: কিছু গবেষক বঙ্কিমকে মুসলমান-বিরোধী, সাম্প্রদায়িক হিসাবে দেখানোর চেষ্টা করেছেন। কিন্তু বঙ্কিম নিজেই 'বঙ্গদর্শন'-এ ১২৮০ বঙ্গাব্দের পৌষ সংখ্যায় লিখেছেন যে- "বাঙ্গালা হিন্দু-মুসলমানদের দেশ- একা হিন্দুর দেশ নহে।" ১৯৩৮-এ বঙ্কিম জন্মশতবর্ষ উপলক্ষ্যে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় রেজাউল করীমের প্রকাশিত প্রবন্ধগুলি সংকলন আকারে ১৯৪৪ সালে বঙ্কিমচন্দ্র ও মুসলমান সমাজ নামে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। মুসলিম লীগের প্ররোচনায় কলকাতার রাস্তায় শত শত কপি আনন্দমঠ পোড়ানোর প্রতিবাদ করে রেজাউল করীম লেখেন, "আনন্দমঠকে অগ্নিদগ্ধ করিয়া ইহারা যে মনোবৃত্তির পরিচয় দিলেন তাহা অতীব জঘন্য। স্বাধীন চিন্তার পথ রুদ্ধ করিবার করিবার জন্য এই যে প্রচেষ্টা, ইহা ইসলামকে উদ্ধার করিবে না। ইহা লইয়া যাইবে মুসলমানকে অধঃপতনের দিকে..... ভূলুণ্ঠিত হইল মুসলমানের স্বাধীন চিন্তার শক্তি....।" তিনি আরও লিখেছেন- "আজ আনন্দমঠের বিরুদ্ধে যে আন্দোলন আরম্ভ হইয়াছে, তাহা মুসলমানদের অভাব-অভিযোগ দূর করিবার উদ্দেশ্যে নহে। তাহার মূল কারণ- মুসলমান যাহাতে মুক্তি আন্দোলনে যোগ দিতে না পারে তাহার জন্য কতকগুলি ছল বাহির করিবার দুরভিসন্ধি।" বন্দেমাতরম প্রসঙ্গে তিনি লেখেন- "অন্যান্য দেশের মুসলমানরা এরূপ গান ব্যবহার করিবার মত পরিস্থিতি পাইলে ধন্য হইয়া যাইতেন। তাই তাঁর মতে বঙ্কিমের নিকট যদি বাঙ্গালী ঋণী হয়, বাংলা ভাষা ঋণী হয়, তবে বাঙ্গালী মুসলমানও সমভাবে তাঁহার নিকট ঋণী- সর্বাংশে ঋণী।"

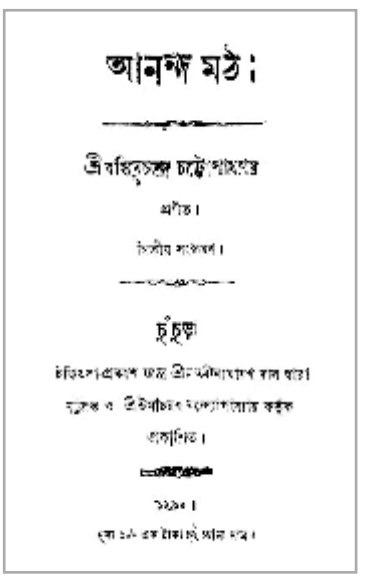
আনন্দ মঠ;

শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

প্রণীত।

দ্বিতীয় সংস্করণ।

চুঁচুড়া

১৮৮৩।

১৮৮৩ সালে প্রকাশিত 'আনন্দ মঠ'-এর দ্বিতীয় সংকরণের প্রচ্ছদ।

রেজাউল করীম দেখাচ্ছেন যে, বঙ্গজননীর সপ্তকোটি সন্তানকেই বঙ্কিম স্বাধীনতার সংগ্রামে আহ্বান করছেন। তিনি বলেছেন, বন্দেমাতরম কোন হিন্দু দেব-দেবীর পূজার গান নয়। এখানে দেশকে বন্দনা করা হয়েছে। তাকে কোথাও এবাদৎ বা সেজদা করতে বলা হয়নি। এই বঙ্কিমচন্দ্র ও মুসলমান সমাজ গ্রন্থের ভূমিকা লিখেছেন প্রখ্যাত ইতিহাসবিদ যদুনাথ সরকার। সেখানে তিনি বঙ্কিমচন্দ্র ও বন্দেমাতরম্-কে ইসলাম-বিরোধী সাজানোর মুসলিম লীগের চক্রান্তের বিরোধিতা করেছেন।

ইতিহাসবিদ অমলেশ ত্রিপাঠী লিখেছেন, "বঙ্কিমচন্দ্রের লেখনী কখনোই সৎ মুসলমানদের বিরুদ্ধে বিষোদগার করেনি। তাঁর রচনায় নিন্দিত হয়েছিলেন কেবলমাত্র অত্যাচারী বা অপদার্থ মুসলমান শাসকবর্গ। তাঁর বিরুদ্ধে পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ আনা চলত যদি তিনি আকবর বা হুসেন শাহের মত কোন সুশাসকের কুৎসা করতেন।" পশুপতি, ভবানন্দ, গঙ্গারাম, সীতারাম প্রভৃতি হিন্দু চরিত্রের খারাপ দিকও তিনি তুলে ধরেছেন।

চরমপন্থার উদ্ভবে বঙ্কিমচন্দ্র: কংগ্রেসের নরমপন্থীদের নীতি ও কর্মপন্থার তীক্ষ্ণ সমালোচনা করে বঙ্কিমচন্দ্রই চরমপন্থার উত্থানের পথ প্রশস্ত করে দিয়েছিলেন। কমলাকান্তের দপ্তরে 'পলিটিকস্' রচনায় তিনি কমলাকান্তের মুখ দিয়ে নরমপন্থীদের সমালোচনা করে বলিয়েছিলেন- "জয় রাধে কৃষ্ণ! ভিক্ষা দাও গো! ইহাই আমাদের পলিটিকস্।" তিনি এই প্রবন্ধে কলুর পুত্র সংক্রান্ত একটি গল্পে নরমপন্থীদের রাজনীতিকে 'কুক্কুর জাতীয় রাজনীতির' সঙ্গে তুলনা করেন এবং এর পরিবর্তে 'বৃষ জাতীয় রাজনীতি' গ্রহণ করার কথা বলেন।

এহেন বঙ্কিমচন্দ্র- যিনি শুধু সাহিত্যসম্রাট এবং বাংলা সাহিত্যের ভগীরথই নন- তাঁর রচনার সামাজিক, রাজনৈতিক ও দার্শনিক গুরুত্বও ছিল অপরিসীম। বঙ্গ তথা ভারতবর্ষে জাতীয়তাবাদের উত্থানের পিছনে তাঁর রচনাগুলি অগ্রগণ্য ভূমিকা পালন করেছিল। কিন্তু তিনি কি তাঁর যথার্থ স্বীকৃতি পেয়েছেন? তাঁর এই অবদানগুলোকে নিয়ে কি যথেষ্ট চর্চা হয়েছে? ভারতবর্ষে জাতীয়তাবাদের উদগাতা ঋষি বঙ্কিমকে শুধুমাত্র নৈহাটির বঙ্কিম করে রাখার প্রয়াস কি ইচ্ছাকৃত না অনিচ্ছাকৃত? পাঠকদের ওপরই তা বিচারের ভার থাকল।

তথ্যসূত্রঃ

১। বঙ্কিম রচনাসংগ্রহ (তিন খণ্ড), স্বাক্ষরতা প্রকাশন, কলকাতা, ১৯৭৩।

২। অমলেশ ত্রিপাঠী, ভারতের মুক্তিসংগ্রামে চরমপন্থী পর্ব, আনন্দ, কলকাতা, ১৯৮৭।

৩। রেজাউল করীম, বঙ্কিমচন্দ্র ও মুসলমান সমাজ, র‍্যাডিক্যাল ইম্প্রেশন, কলকাতা, ২০১৪ (প্রথম প্রকাশ ১৯৪৪)।

৪। রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, 'ঐতিহাসিক গবেষণায় বঙ্কিমচন্দ্র', কমল চৌধুরী (সম্পাদিত), ইতিহাস চিন্তা (প্রথম খণ্ড), দে'জ পাবলিশিং, ২০১০, পৃষ্ঠা-৫২৪-৫২৮ (মূল প্রবন্ধটি 'নারায়ণ' পত্রিকায় ১৩২২ বঙ্গাব্দের বৈশাখ মাসে প্রকাশিত হয়)।

সার্ধশতবর্ষে বন্দেমাতরম্: ফিরে দেখা

কৌশিক কর্মকার

যে গ্রন্থটি বাংলার সশস্ত্র সংগ্রামী, বিপ্লবীদের বেদগ্রন্থ হয়ে উঠেছিল, ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের লেখা সেই 'আনন্দমঠ' উপন্যাসের প্রেরণা ছিল বাসুদেব বলবন্ত ফাড়কে। তাঁর জীবনযাত্রা ও কর্মপন্থার আদলে 'আনন্দমঠে'র সন্ন্যাসীদের চরিত্রায়ন ঘটেছে। আর সেই সন্ন্যাসীদের সকল প্রেরণার উৎস কোথায়? কোন্‌মন্ত্রে? সেই মন্ত্র হল: 'বন্দে মাতরম্'।

বাসুদেব বলবন্ত ফাড়কে; ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের সশস্ত্র বিপ্লবের জনক। স্বাধীনতা সংগ্রামের সূচনা পর্বে যে বিপ্লবীর কর্মকাণ্ড দোর্দণ্ডপ্রতাপ ব্রিটিশের রাতের ঘুম উড়িয়ে দিয়েছিল, ব্রিটিশ প্রশাসন যার মাথার দাম ধার্য করলে পাল্টা যিনি গভর্নরের মাথার দাম ঘোষণা করার ক্ষমতা রাখতেন, সেই অকুতোভয়, অদম্য বিপ্লবী হলেন বাসুদেব বলবন্ত ফাড়কে। তাঁর জীবন যেন সাহসিকতার প্রতিচ্ছবি। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে তিনি একা যুদ্ধ ঘোষণা করেছিলেন। পরবর্তীকালে যে গ্রন্থটি বাংলার সশস্ত্র সংগ্রামী, বিপ্লবীদের বেদগ্রন্থ হয়ে উঠেছিল, ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের লেখা সেই 'আনন্দমঠ' উপন্যাসের প্রেরণা ছিল বাসুদেব বলবন্ত ফাড়কে। তাঁর জীবনযাত্রা ও কর্মপন্থার আদলে 'আনন্দমঠে'র সন্ন্যাসীদের চরিত্রায়ন ঘটেছে। আর সেই সন্ন্যাসীদের সকল প্রেরণার উৎস কোথায়? কোন্‌মন্ত্রে? সেই মন্ত্র হল: 'বন্দে মাতরম্'। সন্ন্যাসী ভবানন্দের কথায়: 'আমরা অন্য মা মানি না – জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী। আমরা বলি, জন্মভূমিই জননী, আমাদের মা নাই, বাপ নাই, ভাই নাই, বন্ধু নাই, -স্ত্রী নাই, পুত্র নাই, ঘর নাই, বাড়ী নাই, আমাদের কাছে কেবল সেই সুজলা, সুফলা, মলয়জসমীরণশীতলা শস্যশ্যামলা,-'।

'আনন্দমঠ' উপন্যাসের কেন্দ্রে রয়েছে 'বন্দে মাতরম' সংগীত। তবে 'বন্দে মাতরম' রচিত হয়েছিল আগেই, পরবর্তীকালে 'আনন্দমঠে' তা অন্তর্ভুক্ত হয়। ১২৮৯ বঙ্গাব্দ, ১৮৮২ খ্রিস্টাব্দে 'আনন্দমঠ' উপন্যাসের প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয়, তার আগে অবশ্য 'বঙ্গদর্শনে'র পাতায় ধারাবাহিকভাবে তা প্রকাশিত হয়েছিল। ১২৮৭ বঙ্গাব্দের চৈত্র সংখ্যায় উপন্যাসের প্রথম কিস্তিতেই গানটি মুদ্রিত হয়। তবে গানটি লিখিত হয়েছিল তারও বছর পাঁচেক আগে, ১২৮১-৮২ বঙ্গাব্দ, ১৮৭৫-৭৬ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ। বঙ্গদর্শনের ১২৮১ বঙ্গাব্দের কার্তিক সংখ্যায় প্রকাশিত হয় 'আমার দুর্গোৎসব', যেখানে প্রথম লক্ষ করা যায় বঙ্কিম দেশকে 'মা' রূপে অভিহিত করেছেন। ফাল্গুন সংখ্যায় প্রকাশিত হয় 'একটি গীত'। এই দুটি রচনায় 'বন্দে মাতরম'-এর ধারণা ব্যক্ত হয়েছে। তাই ধরা হয়, এই সময়েই, ১৮৭৫ খ্রিস্টাব্দে 'বন্দে মাতরম'-এর উৎপত্তি। ১৯০৭ খ্রিস্টাব্দে লেখা ঋষি অরবিন্দের একটি উদ্ধৃতিও তার সাক্ষ্য বহন করে: 'It was thirty two years ago that Bankim wrote his great song and few listened; but in a sudden moment of awakening from long delusions the people of Bengal looked round for the truth

and in a fated moment somebody song Bandemataram.'

'বন্দে মাতরম' কে বঙ্কিমচন্দ্র জাতীয় সঙ্গীত হিসেবেই রচনা করেছিলেন। রচনার অব্যবহিত পরেই তিনি যদুনাথ ভট্টাচার্যকে সুর দিতে বলেন। হুগলির গোপালচন্দ্র ধর ১৮৭৬ সালে দেশমল্লার রাগে 'বন্দে মাতরম' গেয়ে শোনান। ১৮৭৯ সালে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের নাটক 'পুরুবিক্রমে' 'বন্দে মাতরম' উল্লিখিত হয়। ১৮৮৫ সালে 'বালক' পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথের ভ্রাতুষ্পুত্রী প্রতিভা 'বন্দে মাতরম'-এর স্বরলিপি প্রকাশ করেন। 'বন্দে মাতরম'কে 'বালক' পত্রিকা 'বিখ্যাত গান' হিসেবে উল্লেখ করে।

মূলত 'আনন্দমঠ' প্রকাশের পর থেকেই 'বন্দে মাতরম' ব্যাপক পরিচিতি লাভ করে ও অচিরেই জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। 'বন্দে মাতরম' হয়ে ওঠে পরাধীন জাতির শক্তিমন্ত্র। ১৮৯৬ সালের কলকাতা কংগ্রেসে রবীন্দ্রনাথ 'বন্দে মাতরম' গেয়ে শোনান। ১৯০৫ পরবর্তী বঙ্গভঙ্গ পরবর্তী আন্দোলনে 'বন্দে মাতরম' সঙ্গীত গোটা বাংলাকে মথিত করে তোলে; জাতীয় সংগীতের মর্যাদা লাভ করে। 'বন্দে মাতরম' শ্লোগান হয়ে ওঠে পরাধীন জাতির প্রতিবাদের প্রতীক। ১৯০৫ সালের বারাণসী কংগ্রেসে নেতাদের আপত্তি সত্ত্বেও সাধারণ কর্মীদের জোরাজুরিতে সরলা দেবী চৌধুরাণী 'বন্দে মাতরম' গান, যিনি আগেই 'বন্দে মাতরম'-এর সুরারোপ করেছিলেন। 'বন্দে মাতরম' নামের পত্রিকা প্রকাশিত হতে থাকে, 'বন্দে মাতরম' নামের সভা, সমিতি প্রতিষ্ঠিত হতে থাকে বাংলাজুড়ে। বিশেষভাবে পূর্ব বাংলায় 'বন্দে মাতরম' ছাত্র-যুবকদের হৃদয়ে এক স্থায়ী আসন লাভ করে। ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা পথে ইংরেজদের দেখলেই 'বন্দে মাতরম' ধ্বনি দিয়ে উত্যক্ত করতে থাকে, মিছিলের পুরোভাগে উচ্চারিত হতে থাকে 'বন্দে মাতরম' ধ্বনি, ফাঁসির মঞ্চে ধ্বনিত হয় 'বন্দে মাতরম'। ১৯০৬ সালের ১৪-১৫ এপ্রিল বরিশালে অনুষ্ঠিত হয় কংগ্রেসের প্রাদেশিক সম্মেলন, উদ্যোক্তা ছিলেন বরিশালের অবিসংবাদী নেতা অশ্বিনীকুমার দত্ত। এই সভায় 'বন্দে মাতরম' ধ্বনিত হওয়ার প্রতিবাদে পুলিশ ব্যাপক লাঠিচার্জ করে ও সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে গ্রেপ্তার করে দু'শো টাকা জরিমানা করে। জরিমানার টাকা প্রদান করে সুরেন্দ্রনাথ সভা মণ্ডপে ফিরে এলে 'বন্দে মাতরম' ধ্বনির গর্জন সম্পূর্ণ বরিশাল শহরকে অভিভূত করে। দ্বিতীয় দিনের অধিবেশন শুরু হয় 'বন্দে মাতরম' সংগীত দিয়ে, গানের শেষে গাওয়া হয়: 'মাগো, যায় যেন জীবন চলে, শুধু তোমার কাজে জগৎ মাঝে, বন্দে মাতরম্বলে।'

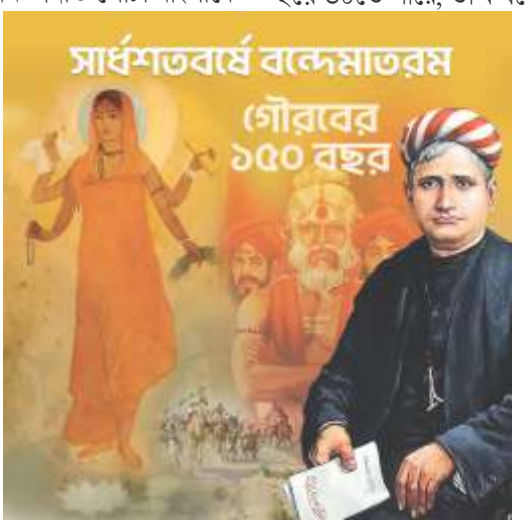

কেবল বাংলা নয়, 'বন্দে মাতরম' ধ্বনি সম্পূর্ণ ভারতকে আন্দোলিত করে তুলেছিল। ১৯০৬ সালে বিনায়ক দামোদর সাভারকর বোম্বাইয়ের একটি সাময়িক পত্রে 'বন্দে মাতরম' সম্বন্ধে প্রবন্ধ লিখে আন্দামানে নির্বাসিত হন। ইংরেজদের পোষ্যপুত্র হায়দ্রাবাদের নিজাম 'বন্দে মাতরম' উচ্চারণের অপরাধে এক কিশোরের প্রাণ কেড়ে নেন; ওসমানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের এক ছাত্রের আঠার বছরের কারাদণ্ড হয়। সরলা দেবী চৌধুরাণী বিবাহের পর পাঞ্জাবে অভিবাসিত হলে সেখানে 'বন্দে মাতরম' সংগীতকে জনপ্রিয় করে তোলেন। মহারাষ্ট্রেও 'বন্দে মাতরম' বিশেষ জনপ্রিয়তা লাভ করে। 'বন্দে মাতরম' বিষয়ক সেখানে একাধিক গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। কেবল দেশে নয়, বিদেশের মাটিতেও 'বন্দে মাতরম' গীত, ধ্বনিত হতে থাকে।

সর্বজন গৃহীত, সর্বজন স্বীকৃত 'বন্দে মাতরম' সংগীতের উপর যে কখনো সাম্প্রদায়িকতার ও পৌত্তলিকতার অভিযোগ উঠতে পারে, কংগ্রেসের সেকুলার নেতৃবৃন্দ যে কখনো তার অঙ্গচ্ছেদে উদ্যোগী হয়ে উঠতে পারে, তা কখনো ভাবা যায়নি। বঙ্কিমচন্দ্র 'আনন্দমঠে'র প্রথম সংস্করণে সন্তান ও ইংরেজদের মধ্যে সংগ্রামের কথা বলেছিলেন; সরকারের চাপে পরবর্তী সংস্করণে ইংরেজদের স্থান মুসলমানদের দ্বারা পরিবর্তিত হয়। 'বন্দে মাতরম' -এর 'ত্বং হি দুর্গা দশপ্রহরণধারিণী/ কমলা কমল-দলবিহারিণী/ বাণী বিদ্যাদায়িনী নমামি ত্বাং' পংক্তিত্রয় পৌত্তলিকতার অভিযোগে বিদ্ধ। যদিও বঙ্কিমচন্দ্র 'আনন্দমঠে' উল্লেখ করেছেন 'তেত্রিশ কোটি দেবতার পূজা আর্যধর্ম নহে, সে একটা লৌকিক অপকৃষ্ট ধর্ম।' আদতে 'বন্দে মাতরম' সংগীতে বলা হয়েছে দুর্গা, কমলা, বাণীদেবীর চেয়েও বড় আমার দেশ, দেশই দুর্গা, কমলা, বাণীদেবী। ১৯৩৭ সালের অক্টোবরে কলকাতায় কংগ্রেসের ওয়ার্কিং কমিটির অধিবেশনে 'বন্দে মাতরম' আলোচনার বিষয়বস্তু হয়ে ওঠে; কারণ তার আগে কলকাতায় 'আনন্দমঠ' পোড়ানোর উৎসব সংঘটিত হয়েছিল। ১৯২৩ সালে কংগ্রেসের কাকিনাড়া অধিবেশনে 'বন্দে মাতরম' গাওয়ার অপরাধে কংগ্রেস সদস্য মৌলানা মহম্মদ আলি ও শওকত আলি মঞ্চ ত্যাগ করেন। এহেন অবস্থায় কংগ্রেস সভাপতি জওহরলাল নেহরু 'বন্দে মাতরম' সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের অভিমত জানতে চান। রবীন্দ্রনাথ জানান, গানের প্রথম প্যারাকে বিচ্ছিন্নভাবে দেখা যেতে পারে বা আনন্দমঠ থেকেও গানটিকে বিচ্ছিন্নভাবে বিবেচনা করা যেতে পারে: 'কিন্তু আমি অনায়াসে স্বীকার করি যে, বঙ্কিমচন্দ্রের সমগ্র 'বন্দে মাতরম্' সংগীতটি যদি উহার অন্যান্য ইতিহাসের সহিত পড়া যায় তাহা হইলে উহার এমন অর্থ করা যায় যাহার ফলে মুসলমানদের মনে আঘাত লাগিতে পারে, কিন্তু এই জাতীয় সংগীত যদিও সমগ্র সংগীত হইতে গৃহীত দুইটি প্যারামাত্র, তথাপি উহা যে

সর্বদা কেন সমগ্র সংগীতের কথা স্মরণ করাইয়া দিবে, তাহার যুক্তিসংগত কোন কারণ নাই। উহার সম্পূর্ণ স্বাতন্ত্র্য আছে এবং উহার নিজস্ব এমন একটা উদ্দীপনাময় বৈশিষ্ট্য আছে যাহা, আমার মনে হয়, কোন ধর্ম বা সম্প্রদায়ের মনে আঘাত করে না।' 'প্রবাসী' সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় জানান, 'বন্দে মাতরম্' গানে কোথাও মুসলমান বিদ্বেষ নেই এবং গানটি ভীষণভাবে অন্তর্ভুক্তিমূলক; এখানে মুসলমানদেরও মাতৃভূমির সন্তান হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে; 'সপ্তকোটি' সংখ্যাটিই যার প্রমাণ। জওহরলাল নেহরুর সভাপতিত্বে ১৯৩৭ সালের কলকাতায় কংগ্রেসের ওয়ার্কিং কমিটির অধিবেশনে 'বন্দে মাতরম' -এর অঙ্গচ্ছেদনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়: 'Taking all things into consideration, therefore, the Committee recommends that wherever the 'Bande Mataram' is sung at national gatherings only the first two stanzas should be sung, with perfect freedom to the organisers to sing any other song of an unobjectionable character, in addition to, or in place of the 'Bande Mataram' song.' খুব স্পষ্টভাবে বলা যায় কেবল মুসলমান সম্প্রদায়কে খুশি করার জন্য 'বন্দে মাতরম'-এর এহেন বিকৃতি ঘটিয়েছিল নেহরুর নেতৃত্বাধীন কংগ্রেস। বিপ্লবী পুলিন দাসের বক্তব্য এপ্রসঙ্গে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ: 'কংগ্রেস যেদিন হইতে স্বাধীনতার জন্য হিন্দু মুসলমানের মিলনের বাণী প্রচার করিতে লাগিল, সেদিন হইতে মুসলমানগণও ভাবিতে লাগিল যে, মুসলমানদের কৃপা ব্যতীত হিন্দুগণ নিতান্তই নগণ্য।'

নেহরু 'বন্দে মাতরম' -এর অঙ্গচ্ছেদ ঘটিয়ে এক নির্লজ্জ তোষণের দৃষ্টান্ত স্থাপন করলেন। কিন্তু যাদের তুষ্ট করার জন্য এই অপকর্ম করলেন, তারা কি আদৌ সন্তুষ্ট হয়েছিল? ১৯৩৮ সালে মুসলিম লিগের প্রবক্তা জিন্না গান্ধীজির কাছে এগারো দফা দাবি পেশ করেন, সেখানে প্রথম দাবি ছিল 'বন্দে মাতরম'-এর সম্পূর্ণ বর্জন। আসমুদ্রহিমাচল যে ধ্বনিকে আশ্রয় করে স্বাধীনতা সংগ্রামের লড়াইয়ে অবতীর্ণ হয়েছিল, সেই পবিত্র 'বন্দে মাতরম'-এর অঙ্গচ্ছেদের অনিবার্য অভিশাপ হিসেবে নেমে এসেছিল দেশভাগ; জিন্নার নেতৃত্বাধীন মুসলিম লিগ মাতৃভূমির অঙ্গচ্ছেদ ঘটালো, কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ তা মেনে নিয়ে ক্ষমতার আসন অধিগ্রহণ করলেন। যে পবিত্র 'বন্দে মাতরম' ধ্বনি পূর্ববঙ্গের আকাশ-বাতাস বিদীর্ণ করে তুলেছিল, সেই পূর্ববঙ্গের আপামর হিন্দুর কাছে এক চূড়ান্ত অভিশাপ রূপে নেমে এলো এই স্বাধীনতা; বলা বাহুল্য ক্ষমতাসীন দিল্লির শাসকদের তাতে কিছু যায় আসেনি। মিথ্যে সেকুলারিজমের এই ভূত এখনও আমাদের তাড়া করে বেড়াচ্ছে, তা থেকে বেরিয়ে আসা জরুরি।

জীবৎকালে বঙ্কিমও এই জাতিকে নিয়ে খুব একটা আশাবাদী ছিলেন না। এপ্রসঙ্গে একটা সরস ঘটনার উল্লেখ করা যেতে পারে। কালীপ্রসন্ন ঘোষ 'আনন্দমঠের মূলমন্ত্র' বিষয়ক একটি প্রবন্ধ লিখতে উদ্যোগী হয়েছিলেন। 'বন্দে মাতরম' ই আনন্দমঠের মূলমন্ত্র। কালীপ্রসন্নকে লেখা বঙ্কিমের চিঠিতে তাঁর দূরদর্শিতার প্রমাণ মেলে: 'আমি বা আনন্দমঠ লিখিয়া কি করিব আর আপনি বা তাহার মূল মন্ত্র বুঝাইয়া কি করিবেন? এ ঈর্ষাপরবশ আত্মোদরপরায়ণ জাতির উন্নতি নাই। বলো বন্দে উদরং।' আনুষ্ঠানিকভাবে 'বন্দে মাতরম' সংগীত সর্বশেষ গাওয়া হয় ১৯৪৭ সালের ১৪ আগস্টের মধ্য রাত্রিতে। 'বন্দে মাতরম'-এর মধ্য দিয়ে যে অনুষ্ঠান সূচিত হয়েছিল ও শেষ হয়েছিল 'জনগণমন' দিয়ে। এরপর ১৯৫০ সালের ২৪ জানুয়ারি গণ পরিষদের সভাপতি রাজেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষণা করেন, 'জনগণমন' হবে দেশের জাতীয় সংগীত আর 'বন্দে মাতরম'কে দেওয়া হবে সমমর্যাদা! আদতে 'বন্দে মাতরম' কখনোই সমমর্যাদা পায়নি, কারণ একটি দেশে দু'টি জাতীয় সংগীত থাকতে পারে না। বিশ শতকের অন্যতম শ্রেষ্ঠ চিন্তক রেজাউল করীম তাঁর 'অহিন্দুর দৃষ্টিতে বঙ্কিম-প্রতিভা' শীর্ষক প্রবন্ধে বলেছিলেন: "বন্দে মাতরম' সংগীত যে বঙ্কিমের অমর অবদান। আজ যে-সংগীত ভারতের পল্লিতে পল্লিতে, নগরে নগরে, কাননে-প্রান্তরে নিত্য ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হইতেছে, মূকের মুখে যাহা ভাষা ফুটাইতেছে, ভীত প্রাণে যাহা সাহস জোগাইতেছে, সেই বঙ্কিম ইহার জন্য চির অমর হইয়া রহিবেন।' সততই প্রত্যেক ভারতবাসীর হৃদয়ে বঙ্কিম ও তাঁর 'বন্দে মাতরম'-এর স্থান চির অমর ও চির অম্লান।

সহায়ক গ্রন্থ, পত্র-পত্রিকা:

১। আনন্দমঠ, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
২। কমলাকান্তের দপ্তর, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
৩। বঙ্গ-প্রসঙ্গ, চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়
৪। প্রবন্ধ পঞ্চাশৎ: বিষয় বঙ্কিমচন্দ্র, অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য
৫। প্রবন্ধ সংগ্রহ, রেজাউল করীম
৬। স্বস্তিকা, ৭৮ বর্ষ ১১ সংখ্যা

জাতপাত নয়, যে বিহার ভারতের কথা বলে মোদী-নীতীশ বদলে দিয়েছে বিহার

জয়ন্ত গুহ

সে বিহার আর নেই। বদলে গেছে বিহার। বিহারের প্রতিটি মানুষ এখন গামছা উড়িয়ে বুক ফুলিয়ে দেশের যে কোনও জায়গায় বলতে পারে 'হাম বিহারী হ্যায়'। এ বিহার জঙ্গলরাজের কথা বলেনা, জাতপাতের কথা বলেনা, এ বিহার ভারতের কথা বলে। সবার স্বার্থে-সবার প্রয়াসে-সবার বিকাশের কথা বলে এই বিহার।

পটনার গান্ধী ময়দানে বিহারের দশম মুখ্যমন্ত্রীর শপথ গ্রহণের মঞ্চ। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর বাঁ পাশে দাঁড়িয়ে শ্রী নীতীশ কুমার। ডানপাশে রাজ্যপাল শ্রী আরিফ মহম্মদ খান। শুরু হল দেশের জাতীয় সঙ্গীত 'জনগণমন-অধিনায়ক জয় হে ভারতভাগ্যবিধাতা'। মঞ্চে দাঁড়িয়ে গাইছেন শ্রী অমিত শাহ-জেপি নাড্ডা-রাজনাথ সিং সহ বিজেপির শীর্ষনেতৃত্ব। রয়েছেন অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্বশর্মা, উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ, মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফডণবীস, দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী রেখা গুপ্ত প্রমুখ। রয়েছেন অন্ধ্রপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী তথা টিডিপি নেতা চন্দ্রবাবু নায়ডু, এলজেপি (আর) নেতা তথা কেন্দ্রীয় মন্ত্রী চিরাগ পাসওয়ান, হিন্দুস্তানি আওয়াম মোর্চা (হাম)-র নেতা জিতনরাম মাঝি। আর রয়েছে গান্ধী ময়দানে জনতার সমুদ্র। সবাই মিলে গাইছেন ভারতের জাতীয় সঙ্গীত 'জনগণমন-অধিনায়ক জয় হে ভারতভাগ্যবিধাতা'। মুহূর্তের মধ্যে যেন পটনা ময়দান পরিণত হল জাতীয় গণতান্ত্রিক মোর্চার রাষ্ট্রীয় মঞ্চে। জাতপাতের সমীকরণ ভেঙ্গে চুরমার করে দেওয়া এনডিএ-এর শপথ গ্রহণ মঞ্চ একটা কথা পরিষ্কার বুঝিয়ে দিয়েছে। সে বিহার আর নেই। বদলে গেছে বিহার। বিহারের প্রতিটি মানুষ এখন গামছা উড়িয়ে বুক ফুলিয়ে দেশের যে কোনও জায়গায় বলতে পারে 'হাম বিহারী হ্যায়'। এ বিহার জঙ্গলরাজের কথা বলেনা, নকশালবাদের কথা বলেনা, জাতপাতের কথা বলেনা, এ বিহার ভারতের কথা বলে। সবার স্বার্থে-সবার প্রয়াসে-সবার বিকাশের কথা বলে এই বিহার। খুব কি অন্যায় করব যদি বলি- এ বিহার মাথা উঁচু করে বলতে পারে, হোয়াট বিহার থিংস টুডে-বেঙ্গল থিংস টুমরো! মনে রাখতে হবে নরেন্দ্র মোদীর সেই কথা, "আমি বলতে চাই, গঙ্গা কিন্তু বিহার থেকেই বাংলায় যায়। বিহার বাংলা জয়ের রাস্তা বানিয়ে দিয়েছে।" এখানেই না থেমে মোদী বলেছিলেন, বাংলার মানুষকে আশ্বাস দিচ্ছি, আপনাদের সঙ্গে নিয়েই রাজ্য থেকে জঙ্গলরাজ উপড়ে ফেলব। " কিন্তু জাতপাতের বিহার-কে কিভাবে এক সুতোয় বেঁধেছিলেন মোদী-নীতীশের জাতীয় গণতান্ত্রিক জোট।

বিহার নির্বাচনে এনডিএ- এর মানুষের সমর্থনের সুনামি সামনে আসার পর অনেক পণ্ডিত বলেছেন, এই ফলাফল অভূতপূর্ব, অকল্পনীয়, অপ্রত্যাশিত! একেবারেই অপ্রত্যাশিত ছিলনা। কেননা এমন একটা সুনামি যে হবে সে তো অনেক আগে থেকেই বোঝা যাচ্ছিল। শুরু হয়েছিল ২০১০ থেকে। মাঝে নীতীশ কুমার এনডিএ ছেড়ে বেরিয়ে না গেলে এই সুনামি অনেক আগেই আমরা দেখতে পেতাম। এবারের এই বিপুল জনাদেশে পরিষ্কার পরিবারবাদ এবং দুর্নীতিগ্রস্ত জঙ্গলরাজের বিরুদ্ধে মানুষ জাতপাত ভুলে এক হয়ে ভোট দিয়েছে। এই দুই ক্ষেত্রেই বিহারকে এক সুতোয় বেঁধে দিয়েছেন স্বচ্ছ ইমেজের মোদী-নীতীশের এনডিএ। তৃতীয় ক্ষেত্র বা বর্গ, লাভার্থী বা সরকারি যোজনা থেকে যারা সুবিধা পেয়েছে। জাতপাত ভুলে এখানেও মহিলা- যুবা এবং অন্যান্যরা এক হয়ে ভোট দিয়েছে মোদী-নীতীশের এনডিএ-কে।

আসলে সবাই সহজ কথাটা বুঝতে পেরে গিয়েছিল। প্রাথমিক লক্ষ জীবনের মানোন্নয়ন। আর সবচেয়ে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় একজন মহিলার সুরক্ষা। তাঁর ঘরের মেয়ে যেন সুরক্ষিত হয়ে ঘরে ফেরে এবং বাইরে বেরিয়ে তাঁর ঘরের পুরুষের যাতে লালু-জমানার মত বেঘোরে প্রাণ না যায়। আজ বিহারে ঘরের মেয়ে বা কন্যা রাত করে বাইরে বেরোলেও তাঁর মা-বাবা চিন্তা করেনা। পশ্চিমবঙ্গের মত বিহারের মুখ্যমন্ত্রীকে বলতে হয়না- রাত ৮টার পর মেয়েরা যেন বাইরে না থাকে।

আসলে সবাই সহজ কথাটা বুঝতে পেরে গিয়েছিল। প্রাথমিক লক্ষ জীবনের মানোন্নয়ন। আর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় একজন মহিলার সুরক্ষা। তাঁর ঘরের মেয়ে যেন সুরক্ষিত হয়ে ঘরে ফেরে এবং বাইরে বেরিয়ে তাঁর ঘরের পুরুষের যাতে লালু-জমানার মত বেঘোরে প্রাণ না যায়। আজ বিহারে ঘরের মেয়ে বা কন্যা রাত করে বাইরে বেরোলেও তাঁর মা-বাবা চিন্তা করেনা। পশ্চিমবঙ্গের মত বিহারের মুখ্যমন্ত্রীকে বলতে হয়না- রাত ৮টার পর মেয়েরা যেন বাইরে না থাকে। তো পরিবর্তন বা বিকাশ হলে এমনটাই হতে হবে। মমতা ব্যানার্জি এবং তাঁর সহযোগী তেজস্বী-রাহুলদের মত বিকাশের নামে জঙ্গলরাজের ডুগডুগি বাজালে হবেনা। বিহারে যারা জঙ্গলরাজ কখনও দেখেনি তারা তেজস্বীদের প্রচারে পরিষ্কার বুঝে যায় আসলে তখন কি হয়েছিল। আর ক্ষমতায় লালুর দল এলে কি হবে। তো বিহারে নির্বাচনে মুখোমুখি দাঁড়ায় জঙ্গলরাজ আর সুশাসন। মানুষ কোনটা বেঁচে নিয়েছে তা তো ফলাফলেই পরিষ্কার।

২০২০ মতই এবারেও বিহারের এনডিএ জোটে জেডিইউ- এর তুলনায় ভাল ফলাফল করেছে বিজেপি। জেডিইউ- বিজেপি একসঙ্গে থাকলে সবসময়ই ভাল ফলাফল করে বিজেপি। কিন্তু তাতে মোদী- নীতীশ জোটে কোনও টানাপোড়েন হয়না। বরং মোদী-নীতীশ একসঙ্গে বিহারকে জাতপাত থেকে সরিয়ে অ্যাসপিরেশনাল স্টেটে বদলে দিয়েছেন। মানে রাজ্যের বিকাশকে সামনে রেখে সমাজের প্রতিটি বর্গ ও বয়সের মানুষের মনে আকাঙ্ক্ষার জন্ম হয়েছে এবং সেই আকাঙ্ক্ষাপূরণে সরকার তাদের পাশে রয়েছে প্রতিমুহূর্তে-এই বিশ্বাস দিতে পেরেছে বিহারের এনডিএ সরকার। এক্ষেত্রেও মোদী- নীতীশ জুটি জাতপাতের বিভাজন থেকে দূরে সরিয়ে এক করে দিতে পেরেছে বিহারবাসীকে।

রাজনীতিতে দুটি বিষয় খুব গুরুত্বপূর্ন। নিজে লড়াই করা এবং লড়ানো বা অন্যদের লড়াইকে সংগঠিত করা। এই দুটির কোনটাই জানেনা প্রশান্ত কিশোর। তেজস্বী এবং কংগ্রেসকে সুবিধা করে দিতে একজন এজেন্ট হিসাবে এসেছিল প্রশান্ত। কি বলেছিল নির্বাচনের সময় মনে আছে আমাদের! "নীতীশ কুমারের দল যদি ২৫টির বেশী আসন পায় তাহলে রাজনীতি ছেড়ে দেব।" উল্টোদিকে এবারের বিহার নির্বাচনে উজ্জ্বল প্রকাশ চিরাগ পাসোয়ান। চিরাগ- কে এনডিএ- এর মধ্যে নিয়ে আসা নিঃসন্দেহে মোদী-শাহ-এর মাষ্টারস্ট্রোক।

এই নির্বাচনে মানুষের রায়, বিরোধীদলগুলির প্রত্যেকের কাছে যারা দেশ বিরোধিতাকেই রাজনীতি বলে মনে করে তাদের কাছে জোরালো বার্তা। না শোধরালে ভাঙ্গন নিশ্চিত।

আর বাংলায়? বাজনা বাজিয়ে দিয়েছে বিহার। বিসর্জন হবেই। তবে তার আগে দলটা থাকলে হয়।

তৃণমূলের বাংলাদেশী বাঁচাও যাত্রা

শুভ্র চট্টোপাধ্যায়

কথা ছিল বাংলাদেশী অনুপ্রবেশকারীদের চিহ্নিত করা হবে। আটক করা হবে। তারপর এদেশ থেকে বহিষ্কার করা হবে। কিন্তু অবাক কাণ্ড, আগেভাগেই তারা ল্যাজ গুটিয়ে দৌড়! নিজেরাই পালাচ্ছে নাকি যারা জামাইআদরে এদেশে ডেকে এনেছিল এখন ধরা পড়ে যাওয়ার ভয়ে তারাই ওপারে যাওয়ার রাস্তা তৈরি করে দিল? কাদের প্রশ্রয়ে এসেছিল ওরা? আর কাদের পরামর্শেই বা ফিরে যাচ্ছে!

তাঁরা আসলে অনুপ্রবেশকারী—মূলত বাংলাদেশের নাগরিক। কিন্তু তাতে কী? বাংলাদেশের নাগরিক হয়েও তাঁরা দীর্ঘদিন ধরে ভারতের জমি-জল-হাওয়া ব্যবহার করছেন, এখানকার সরকারি সুযোগ-সুবিধা নিচ্ছেন, আবার একই সঙ্গে ভারতীয় নাগরিকদের প্রাপ্য নানা পরিষেবাও ভোগ করছেন। শুনতে অবিশ্বাস্য লাগলেও, ঠিক এই অদ্ভুত পরিস্থিতিরই জন্ম দিয়েছে পশ্চিমবঙ্গের তৃণমূল পরিচালিত রাজ্য সরকারের নীতি। প্রশাসনের নরম মনোভাব, রাজনৈতিক সুবিধা, আর ভোটব্যাঙ্ক রক্ষার চেষ্টা—সব মিলিয়ে বছরের পর বছর ধরে এমন ঘটনা নাকি ঘটতেই থেকেছে।

রাজ্যে এসআইআর শুরু হতেই, একে একে বেরোতে শুরু করেছে বহু বছরের জমে থাকা অস্বস্তিকর তথ্য। যেন পুরোনো ঝুলি থেকে একের পর এক বিড়াল লাফিয়ে বেরিয়ে আসছে। আর সেই সব তথ্য প্রকাশ্যে আসতেই সাধারণ মানুষের মধ্যে উঠছে প্রশ্ন—অনুপ্রবেশকারী বাংলাদেশি ও রোহিঙ্গাদের সত্যিই কি মাথার ছাতা হয়ে দাঁড়িয়েছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়? অভিযোগ বহু বাংলাদেশি ও রোহিঙ্গা অনুপ্রবেশকারীর কাছে রেশন কার্ড, ভোটার কার্ড, এমনকি আধার পর্যন্ত রয়েছে। স্থানীয় রাজনৈতিক নেতাদের প্রত্যক্ষ সাহায্য ছাড়া এমন ঘটনা ঘটার সম্ভাবনা কম। শাসক দলের মদতে অনুপ্রবেশকারীরা এভাবেই বহু প্রশাসনিক সুবিধা পেয়ে যাচ্ছেন বলেই অভিযোগ। অনেকেই মনে করছেন- এভাবে অনুপ্রবেশকারীদের সুবিধা পাইয়ে দেওয়া হচ্ছে মূলত রাজনৈতিক স্বার্থে, ভোটব্যাঙ্ক ধরে রাখতে। ভারতের নিরাপত্তা, জনসংখ্যার ভারসাম্যের জন্য সত্যিই এটা বিপজ্জনক।

বছর ঘুরলেই পশ্চিমবঙ্গে বিধানসভা নির্বাচন। সেই নির্বাচনের আগেই শুরু হয়েছে ভোটার-তালিকা ঝাড়াই-বাছাইয়ের কাজ। সেজন্য চালু হয়েছে এসআইআর। তখনই প্রকাশ্যে আসছে একের পর এক খবর, যা শুনলে কপালে চোখ উঠতে বাধ্য। বাংলাদেশ থেকে বাংলায় ঢোকা এই অনুপ্রবেশকারীদের অনেকের কাছেই রয়েছে ভোটার কার্ড, অনেকেই আবার কোনও ঝামেলা ছাড়াই জোগাড় করে ফেলেছে আধার কার্ডও। নিয়মিত রেশন তোলার পাশাপাশি এমনও ঘটনা রয়েছে যে তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ এই রাজ্যে দু'-তিনবার পর্যন্ত ভোট দিয়ে ফেলেছেন। অথচ তাঁরা ভারতীয় নন—তবুও ভোটের মতো সংবেদনশীল ব্যবস্থায় অংশগ্রহণ করেছেন। আর এই সুবিধার পাশাপাশি পেয়েছেন লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের আর্থিক অনুদানও, যা পাওয়ার বৈধ অধিকার কোনও বিদেশিরই নেই।

দেশজুড়ে সূচনা হয়েছে এসআইআর-এর। প্রথমে বিহারে শুরু হলেও এখন পশ্চিমবঙ্গ-সহ দেশের মোট বারোটি রাজ্যে এই প্রক্রিয়া চালু করা হয়েছে। আর ঠিক এই উদ্যোগ শুরু হতেই রাজ্যের বিভিন্ন সীমান্ত

এলাকায় এক অস্বাভাবিক দৃশ্য দেখা যাচ্ছে- পোঁটলা-পুঁটলি গুছিয়ে একের পর এক বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারী সীমান্তের পথে ছুটছেন। অনেকে রাতদিন অপেক্ষা করছেন, সুযোগ মিললেই বাংলাদেশে ফিরে যাবেন বলে।

উত্তর ২৪ পরগনার স্বরূপনগরের ভারত–বাংলাদেশ সীমান্ত এলাকায় এমন অনেক মানুষকে দেখা যাচ্ছে, যারা ফিরে যাওয়ার জন্য লাইনে দাঁড়িয়ে আছেন, বা সেখানে অস্থায়ীভাবে অবস্থান করছেন। তাঁদের সঙ্গে কথা বললেই সামনে আসছে নানান তথ্য—কীভাবে তাঁরা এখানে এসে নথি জোগাড় করেছেন, কীভাবে সরকারি প্রকল্পের সুবিধা পেয়েছেন, এমনকি কীভাবে বহু বছর ধরে এই ব্যবস্থার ভাঁড়ারে লুকিয়ে ছিলেন।

স্বরূপনগরের এই সীমান্তেই দেশে ফেরার জন্য অপেক্ষা করছেন বাংলাদেশের সাতক্ষীরার বাসিন্দা রোকেয়া বিবি। তিনি জানান, তিনি বাংলাদেশের নাগরিক। তবে ভোট দিতেন এ রাজ্যে। লকডাউনের সময় পদ্মার ওপর থেকে দালালদের হাত ধরে ঢুকে পড়েছিলেন এপার বাংলায়। ঠাঁই জুটেছিল সল্টলেকের সেক্টর ফাইভে। কাগজকুড়ুনির কাজ করে সংসার চালাতেন। তিনি জানান, ৩-৪ বছর ধরে লক্ষ্মীর ভাণ্ডার পেয়েছেন। দুয়ারে সরকারের ক্যাম্পে গিয়েই লক্ষ্মীর ভাণ্ডার করেছেন। তাতে টাকাও ঢুকেছে। দিয়েছেন ভোটও। এই সাতক্ষীরাতেই ফিরে যাচ্ছেন আনোয়ারা বিবিও। তাঁরও বাড়ি সেখানেই। তিনিও কবুল করলেন, এ রাজ্যে ভোট দিয়েছেন। বাংলাদেশে ফিরে যেতে হবে জেনে একরাশ ক্ষোভ উগরে দিলেন তিনি। বললেন, " আমরা এখানে থাকব বলে কাগজপত্র সব করে দিল। আর এখন থাকতে পারছি না। আমাদের তাড়িয়ে দিচ্ছে। তাই বাংলাদেশেই ফিরে যাচ্ছি।" শুধু কী তাই? আদতে বাংলাদেশের নাগরিক, অথচ বাংলায় ঢুকে পড়ে কাগজপত্র সব জোগাড় করে বসে পড়েছেন সরকারি চাকরির পরীক্ষায়ও। এফআরআরও-র চিঠিতেই উঠে এসেছে এই তথ্য। এ ব্যাপারে মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ দেওয়ার কথাও জানিয়েছে ফরেনার্স রিজিওনাল রেজিস্ট্রেশন অফিস। এখানেই উঠছে রাশি রাশি প্রশ্ন। নজরদারি এড়িয়ে এরা কীভাবে পদ্মার এপাড়ে এলেন? এতদিন এখানে থাকলেনই বা কীভাবে? ভারতে বসবাসের কাগজপত্রই বা জোগাড় করলেন কীভাবে? রাজ্যের বিরোধী দলের অভিযোগ, শাসক দল তৃণমূল নেতা-কর্মীদের বদান্যতায় এঁরা জোগাড় করেছেন জাল কাগজপত্র। দিয়েছেন ভোটও। যার জেরে বুথ ফেরত সমীক্ষার যাবতীয় প্রেডিকশনের মুখে ঝামা ঘষে দিয়ে বারবার জয়ী হয়েছে রাজ্যের শাসক দল। এঁদের অনেক প্রার্থীই

আবার জয়ী হয়েছেন লাখ লাখ ভোটে। তা নিয়ে তাঁদের গর্ব করতেও দেখা গিয়েছে প্রকাশ্য সভায়।

স্বরূপনগরের হাকিমপুর চেকপোস্টের কাছে এখন ওপারে ফেরার জন্য অপেক্ষা করছেন শয়ে শয়ে বাংলাদেশি। কেউ কাকভোরে, কেউ আবার রাতের আঁধারেই এখানে চলে এসেছেন। আবার অনেকেই আসছেন দিনের বেলায়। সবাই ইতিউতি দাঁড়িয়ে বসে রয়েছেন কখন ফিরবেন নিজের দেশে, তার অপেক্ষায়। শিশুর কান্না, পরিবারের উদ্বেগ, দেশে ফিরে গিয়ে কী করবেন - এসবেরই ছাপ অপেক্ষারত অনুপ্রবেশকারীদের চোখেমুখে। এঁদের মধ্যে যাঁরা টাকা-পয়সা দিয়ে কাগজপত্র বানিয়ে ফেলেছিলেন বলে অভিযোগ, তাঁদের অনেকেই আবার অভিসম্পাত দিচ্ছেন প্রতারকদের। জানা গিয়েছে, বিএসএফ ইতিমধ্যেই আটক করেছেন ৩০০ জনকে। এঁদের অধিকাংশেরই নথি নেই। সীমান্ত পার হতে গিয়েও ধরা পড়েছে ৪৫ জন। স্থানীয়দের দাবি, সীমান্তে ভিড় করা এই মানুষগুলির সিংহভাগেরই বাড়ি সাতক্ষীরা কিংবা খুলনার গ্রাম। নেতাদের ধরে জুটে গিয়েছিল মাথাগোঁজার ঠাঁই, কাজকর্মও। টাকা-পয়সার বিনিময়ে জোগাড়ও করেছিলেন কাগজপত্র। তবে সেসব কাগজ যে জাল, তা বুঝতে পারেননি তাঁরা। দীর্ঘদিন ধরে পশ্চিমবঙ্গে থাকতে থাকতে এই দেশটাকেই আপন করে নিয়েছিলেন এঁদের অনেকেই। শাসকদলের 'ঋণ' শোধ করতে হাত উপুড় করে তাদের ভোটও দিয়েছিলেন দাবি করলেন অনেকে। তখনও বোঝেননি, যে দেশটায় থাকতে থাকতে ক্রমেই ভালোবেসে ফেলেছিলেন। সেই দেশটাই এখন পর হয়ে গিয়েছে। এবার ফিরতে হবে স্বদেশে, এক অনিশ্চিত ভবিষ্যতের দিকে।

প্রসঙ্গত, লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের টাকা সরাসরি বাংলাদেশীদের অ্যাকাউন্টে দিয়েছে মমতা সরকার। তৃণমূলের বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলে ময়দানে নেমেছেন বিজেপি নেত্রী অগ্নিমিত্রা পল। রাজ্যে এসআইআর আবহে অনুপ্রবেশকারীদের সরকারি প্রকল্পের সুবিধা দেওয়ায় তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন বিজেপি নেত্রী অগ্নিমিত্রা পাল। উল্লেখ্য জাতীয় নির্বাচন কমিশন দেশজুড়ে নিবিড় সংশোধনের কাজ শুরু করতেই উত্তর ২৪ পরগনার বসিরহাটের হাকিমপুরে বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীদের ব্যাপক ভিড় জমেছে। তাঁদের লক্ষ্য এখন সীমান্তের ওপারে বাংলাদেশে যাওয়া। অনুপ্রবেশকারী খোদ বাংলাদেশীদের মুখে শোনা গিয়েছে, কীভাবে লক্ষ্মীর ভাণ্ডার সহ রেশনের মতো সরকারি প্রকল্পের সুবিধা পেয়েছেন! আর তাতেই তৃণমূলকে তোপ দেগেছেন বিজেপি নেত্রী।

ছবিতে খবর

'বন্দে মাতরম্'-এর গৌরবময় সার্ধশতবর্ষের উদযাপনে বিজেপি সল্টলেক কার্যালয়ে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য নেতৃত্ব।

কলকাতার সল্টলেক কার্যালয়ে বিশেষ সাংগঠনিক বৈঠকে কেন্দ্রীয় এবং রাজ্য নেতৃত্ব।

বিজেপির বরিষ্ঠ কার্যকর্তা সুনিপ দাসের প্রতি শেষ শ্রদ্ধা জানাতে রাজ্য বিজেপি প্রধান কার্যালয়, ৬ মুরলীধর সেন লেনে বিজেপি নেতৃত্ব এবং কর্মীবৃন্দ।

সল্টলেক কার্যালয়ে বিজেপির বিশেষ সাংগঠনিক বৈঠকে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য নেতৃত্ববৃন্দ।

আসন্ন পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনকে কেন্দ্র করে কলকাতার সল্টলেক কার্যালয়ে বিশেষ সাংগঠনিক বৈঠকে কেন্দ্রীয় এবং রাজ্য নেতৃত্ব।

সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের ১৫০তম জন্মজয়ন্তী উপলক্ষ্যে আয়োজিত 'রান ফর ইউনিটি' কর্মসূচিতে বিজেপি রাজ্য নেতৃত্ব।

সল্টলেক কার্যালয়ে বিশেষ সাংগঠনিক বৈঠকে কেন্দ্রীয় এবং রাজ্য নেতৃত্ব।

কলকাতা ICCR সভাগৃহে ভারতীয় জনতা যুব মোর্চার "নমো যুব ওয়ারিয়রস"-র শুভ সূচনা অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য নেতৃত্ব সহ কর্মীবৃন্দ।

ছবিতে খবর

পশ্চিমবঙ্গ বিজেপির সল্টলেক কার্যালয়ে বিশেষ সাংগঠনিক বৈঠকে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য নেতৃত্ব।

কলকাতার আইসিসিআর-এ কলকাতা মহানগর বিভাগের বিশেষ সাংগঠনিক বৈঠকে রাজ্য-কেন্দ্রীয় ও জেলা নেতৃত্ব।

বারুইপুরে দক্ষিণ ২৪ পরগনা বিভাগের বিশেষ সাংগঠনিক বৈঠকে রাজ্য-কেন্দ্রীয় ও জেলা নেতৃত্ব।

বিহারে এনডিএ জোটের ঐতিহাসিক বিজয়ের পর বাংলার জেলায় জেলায় বিজেপি নেতৃত্ব এবং কর্মীবৃন্দের বাঁধভাঙা উল্লাস।

ছবিতে খবর

'বন্দে মাতরম্'-এর গৌরবময় সার্ধশতবর্ষের ঐতিহাসিক দিনে জেলায় জেলায় শোভাযাত্রায় বিজেপি নেতৃত্ব এবং কর্মীবৃন্দ।

উলুবেড়িয়ায় হাওড়া-হুগলি বিভাগের বিশেষ সাংগঠনিক বৈঠকে কেন্দ্রীয় এবং রাজ্য নেতৃত্ব।

তৃণমূল সরকারের তোষণ, মিথ্যাচার, নৈরাজ্য ও অপশাসনের প্রতিবাদে সোদপুর ট্রাফিক মোড় থেকে বিটি রোড আগরপাড়া তেঁতুলতলা মোড় পর্যন্ত কলকাতা উত্তর শহরতলী জেলা বিজেপির ডাকে পরিবর্তন যাত্রায় বিরোধী দলনেতা শ্রী শুভেন্দু অধিকারী সহ অন্যান্য নেতৃত্ববৃন্দ।

পুরুলিয়ার কাশীপুরে ১০০০-এরও বেশি মহিলা তৃণমূল ছেড়ে বিজেপিতে যোগদান করলো সাংসদ জ্যোতির্ময় সিং মাহাতোর হাত ধরে।

নবদ্বীপ বিভাগের সাংগঠনিক বৈঠকে বিজেপি কেন্দ্রীয় এবং রাজ্য নেতৃত্ব।

রাঢ় বঙ্গ জোনের আয়োজিত বর্ধমান জেলা কার্যালয়ে "আত্মনির্ভর ভারত সংকল্প অভিযান বক্তা কর্মশালায়" উপস্থিত ছিলেন সাংসদ জগন্নাথ সরকার সহ অন্যান্য নেতৃত্ব ও কর্মীবৃন্দ।

সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের ১৫০তম জন্মজয়ন্তী উপলক্ষ্যে জেলায় জেলায় আয়োজিত 'রান ফর ইউনিটি' কর্মসূচি।

জনজাতীয় গৌরব দিবসে সংসদ ভবনে ভগবান বিরসা মুন্ডার প্রতি রাষ্ট্রপতি শ্রীমতী দ্রৌপদী মুর্মুর শ্রদ্ধার্ঘ্য।

জননায়ক ভগবান বিরসা মুন্ডা

স্বাতী সেনাপতি

“বর্তমানে দেশ 'সবকা সাথ, সবকা বিকাশ' মন্ত্রের শক্তি ধারণ করে আছে। এই মন্ত্র বছরের পর বছর ধরে কোটি কোটি মানুষের জীবনকে রূপান্তরিত করেছে, জাতীয় ঐক্যকে শক্তিশালী করেছে এবং দীর্ঘকাল ধরে অবহেলিত আদিবাসী সম্প্রদায়কে মূলধারায় নিয়ে এসেছে....উন্নয়নে কেউ যেন পিছিয়ে না থাকে তা নিশ্চিত করতে হবে। এটাই হবে ধরতি আবার প্রতি প্রকৃত শ্রদ্ধাজ্ঞাপন। একসঙ্গে আমরা এগিয়ে যাব এবং একটি উন্নত ভারতের স্বপ্ন পূরণ করব।”- জনজাতীয় গৌরব দিবসে প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী।

"উলগুলানের শেষ নাই, ভগবানের মরণ নাই রে মুন্ডারা" মহাশ্বেতা দেবীর লেখা 'অরণ্যের অধিকার' উপন্যাসের একটি সাড়া জাগানো বিখ্যাত লাইন এটি। যারা অর্থ হল বিদ্রোহের কোনো শেষ হয় না। আর এখানে ভগবান বলতে আদিবাসী সমাজের 'ধরতি বাবা' তথা বিরসা মুন্ডাকে বোঝানো হয়েছে। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে এক বিশেষ অধ্যায় জুড়ে রয়েছে আদিবাসী বিদ্রোহের কথা। পাহাড়-জল-জঙ্গলের মানুষের হাত ধরে ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে এক সংগঠিত প্রতিরোধের সূচনা হয়েছিল। আর এই গণবিদ্রোহের সূচনা যার হাত ধরে ঘটে তিনি হলেন আদিবাসী সমাজের ভগবান বিরসা মুন্ডা। ঝাড়খন্ডসহ পূর্ব ভারতের মুন্ডা আদিবাসী সমাজে বিরসা মুন্ডা শুধু একজন নেতাই নন বরং তিনি একজন মুক্তির দূত, এক ধর্মগুরু এবং এক অদম্য সংগ্রামী।

১৮৭৫ সালের ১৫ নভেম্বর উলিহাতু গ্রামে জন্ম হয় বিরসা মুন্ডার। বাবা সুগানা মুন্ডা এবং মা করমি বাহাতুর সন্তান বিরসা মুন্ডার জীবনের শুরুটা ছিল দারিদ্র্যতায় ভরা। তিনি পড়াশোনা করেছিলেন চাঁইবাসার একটি জার্মান মিশনারি স্কুল থেকে। চাঁইবাসার স্কুলে পড়াকালীন বিরসা মুন্ডা খ্রিস্টান ধর্ম গ্রহণ করার পর তাঁর নাম হয় ডেভিড। কিন্তু এক সময় জার্মান এবং রোমান ক্যাথলিক খ্রিস্টানদের মধ্যে বিক্ষোভ শুরু হলে তার আঁচ এসে পড়ে আদিবাসী সমাজে। খ্রিষ্টান ধর্ম পরিত্যাগ করে ১৮৮১ সালে বাঁন্দাগাও গ্রামে ফিরে এসে বিরসা মুন্ডার সঙ্গে পরিচয় হয় জমিদার জগমোহন সিংহের মুন্সি আনন্দ পাওয়ারের। তাঁর প্রভাবেই বিরসা মুন্ডা বৈষ্ণব ধর্ম গ্রহণ করেন। আর এখান থেকেই শুরু হয় তাঁর জীবনের অন্য মোড়। ক্রমেই হিন্দু ধর্মের প্রতি তিনি আকৃষ্ট হয়ে পড়েন এবং সেই সঙ্গে নিজ জাতিকে ঐক্যবদ্ধ হতে আহ্বান জানান। বিরসা মুন্ডা আদিবাসীদের মূল ঐতিহ্যবাহী উপজাতীয় ধর্ম সার্না পন্থা অনুসরণ করার পরামর্শ দেওয়া শুরু করেন। ধীরে ধীরে তিনি আদিবাসী সমাজের কাছে হয়ে উঠলেন ধরতি বাবা অর্থাৎ ভগবান। মাত্র কুড়ি বছর বয়সে অর্থাৎ ১৯৮৫ সালে তিনি এক নতুন ধর্মের ঘোষণা করলেন। এই ধর্মের মূল ভিত্তি ছিল একেশ্বরবাদী মুন্ডা ধর্ম।

১৮৯৪ সালে ব্রিটিশ সরকার অরণ্য আইন প্রবর্তন করে ভারতের বিভিন্ন জঙ্গল এবং অরণ্যে আদিবাসীদের প্রবেশ নিষিদ্ধ করে দেয়। তারা একে একে ভারতের বিস্তীর্ণ অরণ্য অঞ্চল দখল করতে শুরু করে। যে জঙ্গল, গাছপালা আদিবাসীদের সবচেয়ে বড় আশ্রয়স্থল সেই জঙ্গল থেকেই তাদেরকে বিতাড়িত করা শুরু হলো। ব্রিটিশ বাহিনী এই অরণ্যের অধিকারী আদিবাসী সমাজের জমিগুলি অন্যায় ভাবে ছিনিয়ে নিয়ে তাদের

অধিকার খর্ব করে দেয়। তৎকালীন সময়ে ব্রিটিশ বাহিনী ছোটনাগপুরের সংরক্ষিত বন দখল করার উদ্যোগ নেয়। এখানে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে চলতে থাকা মুন্ডাদের নিজস্ব জমির মালিকানা পদ্ধতি ভেঙে দেওয়া হয়। আর তখনই সমগ্র পাহাড়, জঙ্গল অধিকারের লড়াইয়ে জেগে ওঠে বিরসা মুন্ডার ধর্মে দীক্ষিত বিরসাইত বাহিনী। তীর ধনুক নিয়ে নেমে পড়েন তারা যুদ্ধের উদ্দেশ্যে। এখান থেকেই আদিবাসী আন্দোলনের এক অন্য ধারার জন্ম নেয়। জননায়ক হিসেবে আদিবাসী সমাজে উত্থান ঘটে বিরসা মুন্ডার। আদিবাসী সমাজকে সঙ্ঘবদ্ধ করে 'দিকু' অর্থাৎ শত্রুদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের ডাক দেয় বিরসা মুন্ডা। তারা ব্রিটিশদের সাথে যুদ্ধের জন্য গেরিলা পদ্ধতি অনুসরণ করেছিলেন। অর্থাৎ শত্রুদের বিরুদ্ধে আচমকা আক্রমণ। এই গেরিলা যুদ্ধ কৌশল অনুসরণ করে বিরসা মুন্ডা ও তার বাহিনী হঠাৎ হঠাৎ আক্রমণের মাধ্যমে ব্রিটিশ বাহিনীকে দিশেহারা করে দিতে থাকলো।

১৮৯৫ সালে জেলা পুলিশ বিরসা মুন্ডাকে বন্দী করে দু বছরের জন্য কারাদণ্ড দিলেও ১৮৯৭ সালের ৩০শে নভেম্বর বিরসা মুন্ডার মুক্তির পর আবার নতুন করে বিদ্রোহের সূচনা ঘটে। এই বিদ্রোহকে বলা হয় 'উলগুলান'। আদিবাসীদের ভাষায় উলগুলান শব্দের অর্থ বিপ্লব। এই উলগুলান ছিল মুন্ডাদের স্বাধীনতার যুদ্ধ। যা ১৮৯৯ থেকে ১৯০০ সালের মধ্যে সংগঠিত হয়েছিল। এই বিদ্রোহ মুন্ডা বিদ্রোহ নামেও পরিচিত। মূলত এই বিপ্লব বা বিদ্রোহের লক্ষ্য ছিল ব্রিটিশদের অত্যাচারী শাসন থেকে আদিবাসী সমাজের মুন্ডা রাজ প্রতিষ্ঠা, স্বাধীনতা এবং অরণ্যের অধিকারকে ফিরিয়া আনা। ডোম্বরি পাহাড় ছিল বিদ্রোহী মুন্ডাবাহিনীর প্রধান কেন্দ্রস্থল। বিরসা মুন্ডা জনগণের হৃদয়ে ঈশ্বরসম মর্যাদা পেয়েছিলেন। তিনি শুধু যুদ্ধক্ষেত্রেই দক্ষ ছিলেন এমন না বরং ধর্মীয়, সামাজিক এবং রাজনৈতিক দিক থেকেও আদিবাসী সমাজে প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

১৮৯৯ সালের ২৪শে ডিসেম্বর ব্রিটিশ বাহিনীর সঙ্গে মুন্ডা বাহিনীর যে যুদ্ধ হয় তাতে একদিকে চলে ব্রিটিশদের বন্দুকের গুলি এবং অন্যদিকে চলে আদিবাসীদের তীর ধনুক। এক সময় আধুনিক অস্ত্রের কাছে দুর্বল হয়ে পড়ে তীর ধনুক। যার ফলস্বরূপ সেদিন ওখানে অনেক আদিবাসীর মৃত্যু হয়। কিন্তু তবুও ব্রিটিশ পুলিশ বিরসা মুন্ডাকে ধরতে পারেনি। কিন্তু এর কিছুদিন পরেই স্থানীয় মানুষের বিশ্বাসঘাতকতায় যমকোপাই বন থেকে গ্রেফতার হয় উলগুলানের নায়ক বিরসা মুন্ডা। ১৯০০ সালের ৯ই জুন মাত্র ২৫ বছর বয়সে রাঁচির জেলে মৃত্যু হয় বিরসা মুন্ডার। কিন্তু এই মৃত্যু আজও আদিবাসী সমাজের কাছে রহস্যজনক। বিরসা মুন্ডা আদিবাসী সমাজের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে যে গণঅভ্যুত্থানের ডাক দিয়েছিল তা পরবর্তীতে আদিবাসী সমাজকে নিজেদের জন্য লড়াই করতে আরো শক্তিশালী করে তুলেছিল। ইংরেজদের দাসত্ব থেকে মুক্ত হয়ে সম্মানের সঙ্গে বাঁচার চেতনাকে জাগ্রত করেছিলেন তিনিই। সেই

জনজাতীয় গৌরব দিবসে কলকাতায় ভগবান বিরসা মুন্ডার প্রতি রাজ্য সভাপতি শ্রী শমীক ভট্টাচার্যের শ্রদ্ধার্ঘ্য।

থেকেই বিরসা মুন্ডা হয়ে উঠলেন আদিবাসী সমাজের ভগবান 'ধরতি বাবা' তথা জগৎ পিতা।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ভারতীয় জনতা পার্টি কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতায় আসার পর থেকে বিরসা মুন্ডার নামে আদিবাসীদের অগ্রগতির জন্য অনেক উন্নয়নমূলক কাজ করেছে। ভারতীয় জনতা পার্টি ১৫ই নভেম্বর দিনটিকে জনজাতীয় গৌরব দিবস হিসেবে ঘোষণা করেছে। স্বাধীনতা সংগ্রাম এবং আদিবাসী জনজাতির অধিকার লড়াইয়ে বিরসা মুন্ডার অবদানকে স্মরণীয় করে রাখতে কেন্দ্রীয় সরকার ২০২১ সালে ঝাড়খণ্ডের রাঁচিতে বিরসা মুন্ডার নামে একটি জাদুঘর স্থাপন করে। এছাড়াও ২০২৩ সালে কেন্দ্রীয় সরকার আদিবাসীদের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, যোগাযোগ ব্যবস্থায় উন্নয়নের জন্য PM Janjati Adivasi Nyaya Maha Abhiyan (PM-JANMAN) নামে একটি প্রকল্প বাস্তবায়িত করেছে, এরপরে ২০২৪ সালে আদিবাসী গ্রাম উন্নয়নের লক্ষ্যে Dharti Aaba Janjatiya Gram Utkarsh Abhiyan (DAJGUA) প্রকল্পের ঘোষণা করা হয়। এবং বিশেষভাবে ২০২৫ সালের ১৫ই নভেম্বর প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বিরসা মুন্ডার ১৫০তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে ৯৭০০ কোটি টাকা মূল্যের আদিবাসী উন্নয়ন প্রকল্পের ঘোষণা করেন।

জনজাতীয় গৌরব দিবসে ভগবান বিরসা মুন্ডার আত্মীয় পরিজনদের সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী।

মমতা সরকারের শাসনে আদিবাসী সমাজের প্রকৃত অবস্থা

THE HINDU

West Bengal tribals battling food scarcity: study

THE INDIAN EXPRESS

Amid Hanskhali furore, tribal girl gang-raped in West Bengal's Santiniketan

THE HINDU

Tribal woman gang-raped in Bengal, allegedly 'fined' by kangaroo court

Business Standard

Two tribal women stripped naked, tortured in West Bengal, says BJP

#AdivasiBirodhiMamata

/BJP4Bengal bjpbengal.org

বিজেপি

এসআইআর

পশ্চিমবঙ্গের জনবিন্যাস রক্ষার শেষ সুযোগ

সৌভিক দত্ত

ইতিহাস কখনো হঠাৎ ভেঙে পড়ে না, ইতিহাস ধীরে ধীরে সতর্কবার্তা পাঠায়। যারা সতর্কবার্তা পড়তে পারে না, তারাই একদিন শরণার্থী শিবিরে ইতিহাস মুখস্থ করে। মনে রাখতে হবে, একটা জাতি যখন নিজের অস্তিত্ব রক্ষার্থে প্রশ্ন তোলে তখন সেটা রাজনীতি নয়, তখন সেটা বাঁচার লড়াই।

একটি ভূখণ্ডের বাসিন্দাদের নিরাপদে নিশ্চিন্ত থাকার জন্য কী কী ফ্যাক্টর প্রয়োজন? হয়তো অনেক কিছুই, কিন্তু সেসবের মধ্যে অন্যতম হলো সেই ভূখণ্ডের জনবিন্যাস। আমি আমার বাড়িতে কতটা শান্তিতে থাকবো, আমি রাস্তায় বের হলে কতটা নিরাপদে বাড়ি ফিরে আসতে পারবো, আমাদের বাড়ির মেয়েরা তাদের সম্মান কতটা রক্ষা করতে পারবে, আমার বাড়ির সম্পদের নিরাপত্তা কতটা- এই সব কিছুই নির্ভর করে আমার আশেপাশে যারা বসবাস করছে তারা কেমন, তার উপরে। আমার পরিবারের আশেপাশে যদি চোর-খুনী-ধর্ষকদের পরিমাণ বেড়ে যায় তবে আমার কাছে বাঁচার একটা মাত্র রাস্তাই খোলা থাকে, আর সেটা হলো আমার পিতৃপুরুষের ভিটেবাড়ি সেই জাত ক্রিমিনালদের হাতে তুলে দিয়ে অন্য কোথাও পালিয়ে গিয়ে উদ্বাস্তু হয়ে জীবনযাপন করা। যেটা পুরো বাংলার একটা বড় অংশের হিন্দুই করেছে। ইদানিং পশ্চিমবঙ্গের মুর্শিদাবাদ বা দক্ষিণ ২৪ পরগনার অনেক হিন্দুরাও করতে বাধ্য হচ্ছে। তবে আরও একটা রাস্তা থাকে বেঁচে থাকার, সেই ক্রিমিনাল সম্প্রদায়ের হাতে নিজেদের তুলে দিয়ে ভাগ্যের হাতে সবকিছু ছেড়ে দেওয়া। বাংলাদেশে এমন অসংখ্য অসংখ্য উদাহরণ আছে।

এই এক মাসও হয়নি একটা ঘটনা সামনে এসেছে। বাংলাদেশের ঝিনাইদহের ১৫ নাম্বার কালিচরণপুর ইউনিয়নের উত্তর কাষ্টসাগরা গ্রামের হিন্দু নারীদের ঘর থেকে তুলে নিয়ে যেত স্থানীয় বিএনপি নেতা রেজাউলের ছেলে নিলয়। তারপর অত্যাচার করা হয়ে গেলে ছেড়ে দিত। এবং এই ঘটনা প্রতিটি পরিবারের সঙ্গে বারবার চলতে থাকে। একটি হিন্দু পরিবার এই ঘটনায় অতিষ্ঠ হয়ে তাদের পুত্রবধূকে অন্যত্র পাঠিয়ে দিলে শিকার হারানোর ক্ষোভে সেই নেতার ছেলে হিন্দু পরিবারটির উপর হামলা চালায়। অর্থাৎ, যদি আমরা আমাদের প্রতিবেশীদের সংখ্যা মানে আমাদের রাজ্যের ডেমোগ্রাফি সঠিক রাখতে না পারি তবে কী হতে পারে তার জলজ্যান্ত নমুনা হলো বাংলাদেশের হিন্দুরা।

BHBCUC (Bangladesh Hindu Buddhist Christian Unity Council) এর দেওয়া একটি রিপোর্ট জানাচ্ছে ৪ আগস্ট ২০২৪ থেকে ৩০ জুন ২০২৫ পর্যন্ত ২,৪৪২টি নথিবদ্ধ হিংস্রতার ঘটনা জানা যাচ্ছে সংখ্যালঘুদের বিরুদ্ধে। অর্থাৎ যেগুলো বাইরে এসেছে, সাহস করে অভিযোগ জানানো গেছে। আর আশেপাশের সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়ের ভয়ে অভিযোগে জানানো হয়নি এমন ঘটনা কয়টি? হয়তো একমাত্র ঈশ্বরই জানেন সেসব।

পশ্চিমবঙ্গে SIR এর কথা বলতে এসে বাংলাদেশের সংখ্যাতত্ত্ব কেন দিলাম? কারণ একটাই, এই SIR হচ্ছে বাংলাদেশ থেকে অবৈধ অনুপ্রবেশকারীদের চিহ্নিত করার জন্য। আর এরা বাংলাদেশ ছেড়ে ভারতে এত ব্যাপকভাবে অবৈধ অনুপ্রবেশ করছে কেন? উত্তর হল, পশ্চিমবঙ্গকে বৃহত্তর বাংলাদেশ অর্থাৎ বাংলাদেশের একটি অংশ বানানোর উদ্দেশ্য। প্রথমে জনবিন্যাস বদল হবে। তারপর কাশ্মীর কিংবা পূর্ব বাংলার মডেলে এখানে সংখ্যালঘু হিন্দুদের বিতারণ করা হবে। তারপর তোলা হবে স্বাধীনতার দাবি। তাতে সমর্থন দেবে ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে বসে থাকা তথাকথিত বুদ্ধিজীবীরা। ঠিক যেমন কাশ্মীরে হচ্ছে আর কি, তারপর যদি কোনোদিন সেই সুযোগ আসে তারা ভারত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে বাংলাদেশে যোগ দেবে। জনবিন্যাস শুধু সংখ্যার খেলা নয়, এটা ভবিষ্যৎ প্রজন্মের ভাগ্যলেখা।

কল্পকাহিনী লাগছে? আজ্ঞে একদমই না। এই পরিকল্পনা তাদের অনেক পুরনো। সেই ১৯৪৭-এই জিন্না সদ্যজাত পাকিস্তানকে পোকায় কাটা পাকিস্তান বলেছিল কারণ কলকাতা বন্দর পাকিস্তানে যায়নি। কলকাতা তথা পশ্চিম দিকের বাংলা সম্পূর্ণভাবে দখল করার পরিকল্পনা ছিল তাদের। তারা ব্যর্থ হয়েছিল শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীদের, আরো বিশেষ করে বলতে গেলে গোপাল মুখোপাধ্যায়ের জন্য। পরবর্তীতে বাংলাদেশের ইসলামিক সমাজতন্ত্রী (কাঁঠালের আমসত্ত্ব?) নেতা মওলানা ভাসানী দ্বিধাহীন কণ্ঠে জানিয়ে দেয়, "আসাম আমার, পশ্চিমবঙ্গ আমার ত্রিপুরাও আমার। এগুলো ভারতের কবল থেকে ফিরে না পাওয়া পর্যন্ত বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও মানচিত্র পূর্ণতা পাবে না।" অর্থাৎ এসব রাজ্যগুলো দখল করলে তবেই বাংলাদেশের মানচিত্র পূর্ণাঙ্গতা পাবে। এবং সেটা হয়েছিল ভারতের সাহায্যে বাংলাদেশের স্বাধীনতা প্রাপ্তির পরে। ভারতের সাহায্যের এক অদ্ভুত প্রতিদান দিয়েছিল তারা। এছাড়াও বাংলাদেশের জামাত বা এই ধরনের অন্যান্য

আজ আমরা এতটাই নির্বীর্য হয়ে পড়েছি যে আমাদের ক্ষমতা নেই তাদের নিজেদের শক্তিতে ঠেকানোর। আমরা সংখ্যাগরিষ্ঠ হয়েও পারবোনা সীমান্ত টপকে এপাশে আসা অনুপ্রবেশকারীদের সঙ্গে লড়াই করতে। আমাদের একমাত্র অপেক্ষা কেন্দ্রীয় সরকার এবং ভারতের নির্বাচন কমিশেনের কড়া পদক্ষেপ। আমরা তাতে অবশ্যই সহযোগিতা করব। কিন্তু যদি কেউ ক্ষুদ্র রাজনৈতিক বা কায়েমি স্বার্থের বশে SIR এরই বিরোধিতা করে, তিনি কিন্তু অপরাধী থেকে যাবেন তার ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে।

উগ্রবাদী দলগুলোও সব সময় পশ্চিমবঙ্গ ও সেভেন সিস্টার্স দখল করার জন্য উৎসাহ দিয়ে এসেছে তাদের নাগরিকদের।

আর তারই ফলশ্রুতি হয়েছে লেবেনস্রম তত্ত্বর পূর্ববঙ্গীয় প্রয়োগ। বর্ডার টপকে জলস্রোতের মতো অবৈধ অনুপ্রবেশ। একটি প্রথম সারির নিউজ চ্যানেলের ভাইরাল ভিডিওতে দেখা গেছে, SIR-এর ভয়ে পালানো একজন মহিলা স্বীকার করছে পাঁচ হাজার টাকা দালালকে দিয়ে সে ভারতে ঢুকেছিল বর্ডার টপকে। এমন যে কত লক্ষ বা কত কোটি ঢুকেছে তার কোন ঠিক নেই। আর তার ফলে হয়েছে পশ্চিমবঙ্গের জনসংখ্যার ভারসাম্য নষ্ট। পশ্চিমবঙ্গ অপরাধ প্রবণতা বৃদ্ধি। সংস্কৃতির অবনমন এবং আরো অনেক কিছু।

আমরা প্রত্যেকেই নিজের নিজের এলাকায় বিগত কিছু বছর ধরে প্রচুর নতুন মুখ দেখতে পেতাম। আচার ব্যবহার ঠিক আমাদের মত নয়। ধূমকেতুর মতো উপস্থিত হত, হাটবাজার বা রাস্তার ধারে বসে শাকসবজি বা ফলমূল নিয়ে বিক্রি করতে। যেকোনো বাচ্চাও তার নরমাল সেন্স দিয়ে বুঝবে যে ওই কটা ফল বা শাকসবজি বিক্রি করে এই লোকটার দৈনন্দিন চাহিদা মিটবে না। কিন্তু তাও তা বাজারে এসে বসত বা পাড়ায় পাড়ায় ঢুকে ফেরি করত। কিসের উদ্দেশ্যে? বাজারে নিজের অবস্থান পাকাপোক্ত করে আবার নিজেরই মত হঠাৎ উপস্থিত হওয়া কাউকে জায়গা বানিয়ে দিত। অত্যন্ত কম টাকায় ফল-সবজি বিক্রি করে, সব গ্রাহক নিজের কাছে টেনে নিয়ে স্থানীয় বিক্রেতাদের ব্যবসা ছেড়ে দিতে বাধ্য করতো। তারপর সেই ফাঁকা জায়গায় এসে বসত আরো অনেক অচেনা মুখ। আস্ত সব হাট বাজার স্থানীয় বাসিন্দাদের হাতের বাইরে চলে যাওয়ার উপক্রম হয়েছিল।

পাড়ায় পাড়ায় চলত অন্য এক খেলা। অদ্ভুত কম দামে জিনিসপত্র নিয়ে ফেরিওয়ালা ঢুকে পড়তো পাড়ায় পাড়ায়। বিশেষত আসতে দুপুর বেলায় যখন বাড়ির পুরুষেরা অফিসে ব্যস্ত থাকে। মাত্রাতিরিক্ত কম দামে বিক্রি করত তারা জিনিসপত্র। তার উপরে আবার বিক্রি করত ধার বাকিতে। তাদের বাকির খাতায় উঠে যেত প্রতিটি গৃহবধুর নাম ও ফোন নাম্বার। আর তার ফলাফল? এই কিছুদিন আগে জানা গেলো এই বছরের প্রথম পাঁচ মাসেই শুধুমাত্র বারাসাত শহরে স্বামীর ঘর ছেড়ে পালিয়ে গেছে ৫০০ গৃহবধূ। তাও এই তথ্য নথিবদ্ধ অর্থাৎ যেসব স্বামীরা সামাজিক লাজলজ্জা ছেড়ে থানায় অভিযোগ দায়ের করেছে শুধুমাত্র সেই তথ্য এইগুলো। এ যেন জমি দখলে নতুন এক উপায় - গর্ভ দখল। পশ্চিমবঙ্গের নারীদের নিয়ন্ত্রণে এনে যুগপৎ মেয়েদের সংখ্যা বাড়ানো ও স্থানীয় সম্প্রদায়ের সংখ্যা কমিয়ে ফেলা।

একই সঙ্গে বেড়ে চলেছিল অপরাধের পরিমাণ। সীমান্ত সংলগ্ন জেলাগুলোর বাসিন্দা মাত্রই জানেন এখানে জনজীবন কতটা বিপর্যস্ত। খুব স্বাভাবিকভাবেই যারা বেআইনি পথে ভারতে আসে তারা এ দেশের জীবিকার জন্য আইনসম্মত পথ নেবে না। ফলে রমরমা বাড়ছিল জুয়া-চুরি-অবৈধ চোরাচালান-নারী পাচার সহ বিভিন্ন ধরনের অপরাধের। দক্ষিণ কলকাতার একটি রেল স্টেশনের নাম তো কুখ্যাত হয়েই আছে চুরি ছিনতাই এর জন্য। অন্যান্য স্থানেও বাড়ছিল এই প্রবণতা।

আর এর সাথে ছিল সম্পদ সম্পত্তির ক্ষতি করা। এই দেশে বাসিন্দারা ভারতকে নিজের মা মনে করে বলে সিস্টেমের উপরে যতই রাগ হোক আর যা হোক, ভারতের ক্ষতি করে না। কিন্তু দেশ যাদের মা নয়, মাকে বন্দনা করতে যাদের আপত্তি, যারা বাইরে থেকে এসেছে, খুব স্বাভাবিকভাবেই তাদের মনে ভারতের প্রতি কোনো ভালোবাসা থাকা সম্ভব নয়। ফলে নিত্যদিন ভারতের সম্পত্তি বিশেষত রেল ব্যবস্থার উপর আক্রমণ বেড়েই চলছিল। এসবের থেকে পরিত্রাণ খুব প্রয়োজন ছিল।

আর তার জন্যই প্রয়োজন SIR (Special Intensive Revision) ২০০২ সালের ভোটার লিস্টে যাদের নাম নেই অর্থাৎ যারা তার পরে এসেছে তাদের চিহ্নিত করা। তারপর তারা যদি আশ্রয়প্রার্থী হয় তবে CAA তে তাদের নাগরিকত্ব নিতে বলা আর যদি অবৈধ অনুপ্রবেশকারী হয় তাহলে যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়া।

যারা পশ্চিমবঙ্গের বাইরে থেকে এই লেখা পড়বেন তারা কতটা বুঝবেন জানিনা কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের যেকোন সচেতন নাগরিকই এই বিষয়ে একমত হবেন যে আমাদের শেষের সেদিনের খুব দেরি নেই। ইতিমধ্যেই আমাদের বাংলার দুই তৃতীয়াংশ আমরা হারিয়ে ফেলেছি। বহু কষ্টে বহু রক্ত ঘাম ঝরিয়ে এক তৃতীয়াংশ বাঁচানো গিয়েছে বাঙালি হিন্দুর হোমল্যান্ড হিসেবে। কিন্তু এখন তার উপরে পড়েছে হিংস্র হায়নাদেরদের নজর। আর তারা সফল হওয়ার পথেও। আজ আমরা এতটাই নির্বীর্য হয়ে পড়েছি যে আমাদের ক্ষমতা নেই তাদের নিজেদের শক্তিতে ঠেকানোর। আমরা সংখ্যাগরিষ্ঠ হয়েও পারবোনা সীমান্ত টপকে এপাশে আসা অনুপ্রবেশকারীদের সঙ্গে লড়াই করতে। আমাদের একমাত্র অপেক্ষা কেন্দ্রীয় সরকার এবং ভারতের নির্বাচন কমিশেনের কড়া পদক্ষেপ। আমরা তাতে অবশ্যই সহযোগিতা করব। কিন্তু যদি কেউ ক্ষুদ্র রাজনৈতিক বা কায়েমি স্বার্থের বশে SIR এরই বিরোধিতা করে, তিনি কিন্তু অপরাধী থেকে যাবেন তার ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে। নিজের সবকিছু হারিয়ে উদ্বাস্তু হয়ে রিফিউজি ক্যাম্পে বসে নিজের ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে SIR এর বিরোধিতা করা নিয়ে জবাবদিহি করার থেকে অনেক ভালো নয় কি এখনই চাল - ট্রিপল চুরির টাকার ক্ষুদ্র স্বার্থ ত্যাগ করে জাতির জন্য আত্মনিয়োগ করা। যারা SIR এর বিরোধিতা করছেন তাদের অবশ্যই ভেবে দেখা উচিত।

ইতিহাস কখনো হঠাৎ ভেঙে পড়ে না, ইতিহাস ধীরে ধীরে সতর্কবার্তা পাঠায়। যারা সতর্কবার্তা পড়তে পারে না, তারাই একদিন শরণার্থী শিবিরে ইতিহাস মুখস্থ করে। মনে রাখতে হবে, একটা জাতি যখন নিজের অস্তিত্ব রক্ষার্থে প্রশ্ন তোলে তখন সেটা রাজনীতি নয়, তখন সেটা বাঁচার লড়াই। আর বাঁচার লড়াইতে কোনো রাজনৈতিক বিরোধিতা হওয়াটা জাতির কাছে অপরাধ।

আবার একজন
বলে না বসে
SIR এর ভয়ে
কাঁপছে বাংলা!
/BJP4Bengal
bjpbengal.org

মহিলা ক্রিকেটে ভারতের বিশ্বজয়

কংগ্রেসের করুণা নয়, নারীসম্মান মোদী সরকারের মূলমন্ত্র

অভিরূপ ঘোষ

২০২৪ এবং ২০২৫ সাল। দু'ক্ষেত্রেই বিশ্বকাপ জেতার এক সপ্তাহের মধ্যে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর বাসভবনে ডাক পড়ল বিশ্বকাপ জয়ী সদস্য এবং সদস্যাদের। দুটি ক্ষেত্রেই প্রত্যেকের অভিজ্ঞতা শুনলেন এবং একসাথে খাবার খেলেন প্রধানমন্ত্রী। সব থেকে বড় কথা ফটোসেশন বা কঠোর পরিশ্রমে জেতা বিশ্বকাপে স্পর্শ করলেন না প্রধানমন্ত্রী। কংগ্রেস আমলে যা ছিল পরিচিত দৃশ্য। আসলে শুধু অর্থনীতি বা খেলাধুলার ক্ষেত্রে নয়, 'মাই-বাপ' সরকারের ধারণা বদলে সরকারি মানসিকতাতেও সংস্কার এনেছে নরেন্দ্র মোদীর সরকার।

পার্থক্য ছিল, আছে এবং থাকবে।

১৯৮৩ সালে প্রথমবার পুরুষ বিশ্বকাপ জিতেছিল ভারত। নেতৃত্বে কপিল দেব। জেতার বেশ অনেকদিন পর তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে দেখা করতে যান বিজয়ী দলের সদস্যরা। ইন্দিরা গান্ধী সেদিন বিশ্বজয়ীদের অভিজ্ঞতাও শোনেননি আর তাদের আলাদাভাবে বিশেষ সময় দেননি। শুধু ফটোশুট করে বিদায় করেছিলেন। সেই সময়কার ফটো ইন্টারনেটে সৌজন্যে আজকেও পাওয়া যায় সহজে। ছবিতে পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে বিশ্বকাপ হাতে মধ্যমণি হয়ে দাঁড়িয়ে ইন্দিরা গান্ধী। তাঁর পাশে কংগ্রেস নেতা আর তারও পরে বিশ্বজয়ী দলের সদস্যরা।

এরপর ২০০৭ সালে টোয়েন্টি টোয়েন্টি ফরম্যাটে এবং ২০১১ সালে ওয়ানডে ক্রিকেটে বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন হয় ভারতের পুরুষ দল। দু'বারই প্রধানমন্ত্রীর চেয়ারে মনমোহন সিং। দু'বারই বিশ্বকাপ জয়ের পর প্রথাগতভাবে প্রধানমন্ত্রী সঙ্গে দেখা করতে যান বিশ্বজয়ী দলের সদস্যরা। যথারীতি সেখানেও বিশ্বজয়ীদের কথা সেভাবে শোনা হয়নি। আশ্চর্যজনকভাবে মনমোহন সিং নন, এই সাক্ষাতের মধ্যমণি হয়ে থেকে যান সোনিয়া গান্ধী, যিনি কিনা সরকার এবং প্রশাসনের কোন অংশই ছিলেন না। ছিলেন কংগ্রেসের রাজনৈতিক ভাগ্যবিধাতা।

এরপর চলে আসুন ২০২৪ এবং ২০২৫ সালে। প্রথম ক্ষেত্রে পুরুষেরা এবং দ্বিতীয় ক্ষেত্রে মহিলারা ক্রিকেটে বিশ্বচ্যাম্পিয়ন। প্রধানমন্ত্রীর নাম নরেন্দ্র মোদী। দু'ক্ষেত্রেই বিশ্বকাপ জেতার এক সপ্তাহের মধ্যে প্রধানমন্ত্রীর বাসভবনে ডাক পড়ল বিশ্বকাপ জয়ী সদস্য এবং সদস্যাদের। প্রধানমন্ত্রী দুটি ক্ষেত্রেই তাদের প্রত্যেকের অভিজ্ঞতা শুনলেন এবং একসাথে খাবার খেলেন। সব থেকে বড় কথা ফটোসেশন বা অন্য কোন সময় খেলোয়ারদের কঠোর পরিশ্রমে জেতা বিশ্বকাপে স্পর্শ করলেন না প্রধানমন্ত্রী। অবাক হয়ে গেল গোটা পৃথিবী। যেখানে খেলোয়ারদের জিতে আনা ট্রফি হাতে রাজনৈতিক নেতাদের ছবি তোলার দৃশ্য খুব স্বাভাবিক হয়ে গেছে সেখানে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী হয়ে উঠলেন এক নতুন দৃষ্টান্ত।

শোনা যায় ১৯৮৩ সালের বিশ্বকাপ জেতার পর ভারতীয় ক্রিকেটারদের পঁচিশ হাজার টাকা করে দিয়েছিল ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড। হ্যাঁ, ঠিক পড়েছেন। পরিমাণটা পঁচিশ হাজার। বিজেপি সেই সময় ক্ষমতায় ছিল না বলেই পরিমাণটা আজকের মত ১২৫ কোটি বা ৫১ কোটি নয়।

শুধু তাই নয়, ২০০৫ সালে মেয়েদের ক্রিকেট বিশ্বকাপে রানার্স হয় ভারতীয় দল। সেখানে প্রত্যেককে ম্যাচ পিছু মাত্র এক হাজার টাকা করে (অর্থাৎ মোট আট হাজার টাকা) দেওয়া হয়েছিল। হ্যাঁ ফাইনাল অব্দি যাওয়ার পুরস্কার মোট আট হাজার টাকা। শোনা যায় সেই সময় নাকি মহিলা খেলোয়াড়দের বাড়ি ফেরার টাকা পর্যন্ত ছিল না। এক বিখ্যাত অভিনেত্রী টিকিট কেটে ব্যক্তিগত উদ্যোগে তাদের বাড়ি ফিরতে সাহায্য করেন। কংগ্রেস রাজত্বে এতটাই খারাপ অবস্থা ছিল মহিলা ক্রিকেটের। উল্টোদিকে ২০১৭ সালেও মহিলা ক্রিকেটে রানার্স হয়েছিল ভারতীয় দল। সেদিন বিশ্বকাপ জিততে না পারলেও পুরো দলকে নিজের বাসভবনে আমন্ত্রণ জানিয়ে উৎসাহ দেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তিনি প্রমাণ করে দেন হারুক বা জিতুক প্রত্যেক ভারতীয়ের পাশে তিনি সবসময় আছেন। কংগ্রেস আমলে রানার্স হয়ে মোট আট হাজার টাকা করে পাওয়া ভারতীয় দলের প্রত্যেক ক্রিকেটারকে ৫০ লক্ষ টাকা এবং সাপোর্ট স্টাফকে ২৫ লক্ষ টাকা করে মোট প্রায় ১৫ কোটি টাকা দিয়েছিল ভারতীয় বোর্ড (২০১৭ সালে)।

আর আজ ম্যাচ পিছু টেস্টে ১৫ লক্ষ ওয়ানডেতে ৬ লক্ষ এবং টি-টোয়েন্টিতে তিন লক্ষ টাকা করে পায় ভারতীয় মহিলা দল পুরুষদের সমান। এর সাথে পুরস্কার মূল্য বা অতিরিক্ত ঘোষণা মূল্য (যা এবারে বিশ্বকাপ জেতার পর ছিল ৫১ লক্ষ) আলাদা। কংগ্রেস আমলে যা ছিল প্রায় শূন্য।

পার্থক্য ছিল, আছে এবং থাকবে।

এদিকে মমতা ব্যানার্জি ভারতের এক প্রাক্তন ক্রিকেটারকে নিয়ে ইঙ্গিত করেছেন যে ক্রিকেটের সর্বোচ্চ নিয়ামক সংস্থা আইসিসির প্রেসিডেন্ট পদে জয় শাহের জায়গায় নাকি তার থাকা উচিত ছিল!

আমাদের ভুলে চলবে না জয় শাহ ভারতীয় বোর্ডের দায়িত্ব পাবার পরেই পুরুষ

অপ্রতিরোধ্য রিচা ঘোষ।

এবং মহিলা দলের ম্যাচ ফিজ সমান করে দেন। শুধু তাই নয় মহিলা ক্রিকেট দলের জন্য সর্বোচ্চ মানের প্রশিক্ষণ,সর্বোচ্চ মানের কোচিং স্টাফ এবং পুরুষদের মতো সর্বোচ্চ সুযোগ সুবিধার ব্যবস্থা করেন তিনি। পুরুষদের আইপিএলের মত মহিলা ক্রিকেটের জন্য ডব্লিউপিএল চালু করেন তিনি। মহিলা ক্রিকেটের জনপ্রিয়তার জন্য বিনা পয়সার টিকিট থেকে সর্বোচ্চ মানের ব্র্যান্ডিং করার ব্যবস্থা করেছিলেন জয় শাহ। আজ ভারতে মহিলা ক্রিকেটের জনপ্রিয়তা আকাশছোঁয়া করার পিছনে সবথেকে বেশি অবদান ছিল ওই মানুষটারই।

আর উল্টোদিকে যাঁকে মঞ্চে বসিয়ে মমতা ব্যানার্জি এই কথা বললেন, বামফ্রন্টের থেকে যাবতীয় সুবিধা নিয়ে বর্তমানে তৃণমূলের বিশেষ স্নেহধন্য সেই প্রাক্তন ক্রিকেটার ক'দিন আগেই বলেছিলেন মেয়েদের ক্রিকেট খেলার নাকি কোন দরকারই নেই এবং তিনি চান না তাঁর নিজের মেয়েও ক্রিকেট খেলুক!

পার্থক্য ছিল,আছে এবং থাকবে।

যেমন পার্থক্য আছে রাজ্য সরকার ঘোষিত পুরস্কারমূল্যে। বিজেপি নেতৃত্বাধীন এনডিএ সরকার অন্ধ্রপ্রদেশে ঘোষণা করেছে তাদের রাজ্যের বিশ্বকাপ জয়ী সদস্যা শ্রীচরণীকে আড়াই কোটি টাকা, একটা বিলাসবহুল বাড়ি এবং একটি প্রথম শ্রেণীর চাকরি দেবে। বিজেপি নেতৃত্বাধীন মহারাষ্ট্র সরকার ঘোষণা ইতিমধ্যে তাদের তিন বিশ্বকাপজয়ী কন্যা স্মৃতি মান্ধানা, জেমিমা রডরিগেজ এবং রাধা যাদবের প্রত্যেককে দু কোটি পঁচিশ লক্ষ টাকা সহ অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা দিয়ে দিয়েছে। সেখানে পশ্চিমবঙ্গের খেলামেলার সরকার শিলিগুড়ির বিশ্বকাপজয়ী মেয়ে রিচা ঘোষকে দিচ্ছে মাত্র একটা সোনার চেন। ৩৪ লক্ষ টাকা।যেটা রিচা পেয়েছেন সেটা সিএবির তরফ থেকে দেওয়া এবং সিএবির টাকার একটা বড় অংশ আছে বিসিসিআই থেকে। অর্থাৎ ঘুরপথে সেটা বিসিসিআই এর টাকা। আর যে সোনার চেন দুটো জুটেছে রিচা ঘোষের কপালে সেটাও অনেক সমালোচনার পর। পাঠক জানলে অবাক হবেন যেখানে অন্য রাজ্যের বিশ্বকাপজয়ী মেয়েদের বিমানবন্দরে স্বাগত জানাতে উপস্থিত থাকছেন প্রথম সারির নেতা-মন্ত্রীরা সেখানে রিচা ঘোষকে শিলিগুড়িতে ওয়েলকাম করার জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তরফে প্রথম সারির কেউ ছিল না। আমাদের ভুললে চলবে না আজকে বাঙালি অস্মিতা নিয়ে লম্ফঝম্প করা তৃণমূল একসময় মুম্বাইয়ের শাহরুখ খানকে বাংলার ব্র্যান্ড এম্বাসেডর করেছিল। তারপর তাঁর ব্যক্তিগত মালিকানার দল আইপিএল জেতার দল বিপুল জনসমাগম ঘটিয়ে কোটি কোটি টাকা খরচ করে সংবর্ধনার ব্যবস্থা করা হয়েছিল ইডেনে। ওটা কলকাতা ছেয়ে গিয়েছিল পোস্টার আর ফ্লেক্সে। আর আজ সেখানে রিচা ঘোষ দেশের হয়ে বিশ্বকাপ জিতে ঘরে ফিরেছে। আমাদের মাথায় রাখতে হবে রিচা পশ্চিমবঙ্গের প্রথম বিশ্বকাপজয়ী ক্রিকেট খেলোয়াড় (পূর্বে উল্লেখিত ওই প্রাক্তন ক্রিকেটার কিন্তু কোনোদিন বিশ্বকাপ জেতেননি)। সেখানে মহারাষ্ট্র, অন্ধপ্রদেশ বা হরিয়ানায় অনেকেই পুরুষ বিভাগে আগে বিশ্বকাপ জিতেছে। তাই ওই রাজ্যগুলির থেকে অনেক বেশি কিছু বিচার প্রাপ্য ছিল।

কিন্তু ওই, বিজেপির সাথে কংগ্রেস বা তৃণমূলের পার্থক্য ছিল, আছে এবং থাকবে।

দ্য ক্যাপ্টেন।

ভুটান সফর থেকে ফিরেই দিল্লি বিস্ফোরণে আহতদের দেখতে হাসপাতালে প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী।

ভুটান সফরে প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী। সঙ্গে ভুটানের রাজা শ্রী জিগমে খেসার নামগিয়েল ওয়াংচুক।

জন্মদিনে শুভেচ্ছা জানাতে শ্রী লালকৃষ্ণ আদবানির বাসভবনে প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী।

জন্মদিনে শুভেচ্ছা জানাতে শ্রী লালকৃষ্ণ আদবানির বাসভবনে বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জগৎ প্রকাশ নাড্ডা।

পশ্চিম চম্পারন জেলার বেতিয়া-তে নির্বাচনী প্রচারে প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী।

বিহারের মোতিহারি-তে নির্বাচনী জনসভায় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রী অমিত শাহ।

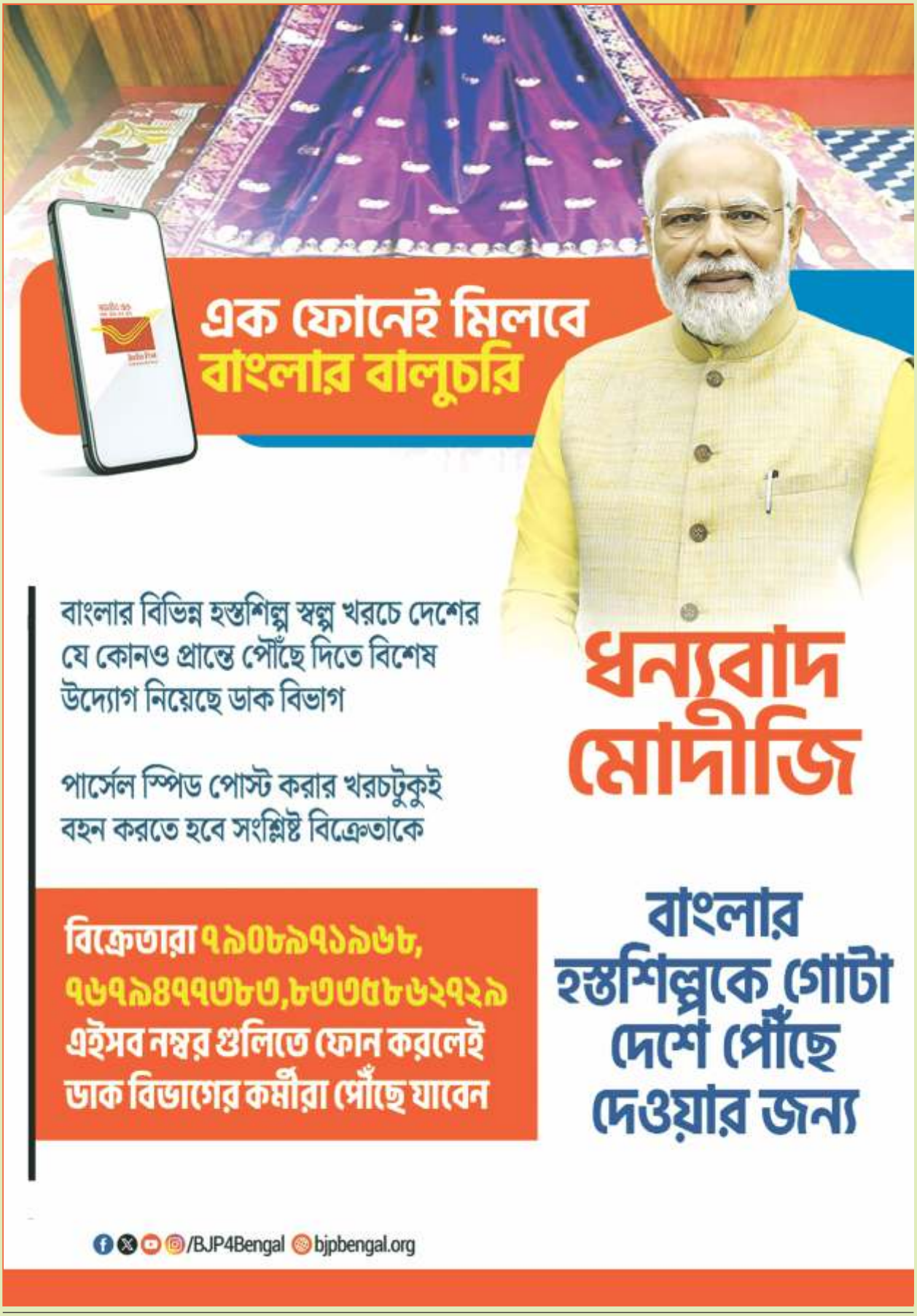

ভারতীয় জনতা পার্টি পশ্চিমবঙ্গ শাখার পক্ষে জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত এবং অঙ্কিত প্রিন্টিং হাউস, কলকাতা - ৭০০ ০০৯ হইতে মুদ্রিত।